নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতি প্রকাশন

২২এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

নূতন সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৬

প্রকাশক : শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
বিভূতি প্রকাশন
২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট—কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন—কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীঅজিত গুপ্ত

ব্লক ও মুদ্রণ : কলার স্টুডিও
৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন—কলিকাতা ৬

বাঁধাই : বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১, সূর্য সেন স্ট্রীট—কলিকাতা-১২

মূল্য : সাড়ে তিন টাকা

ভূমিকা

প্রথম প্রকাশ কালে এই গ্রন্থের নাম ছিল 'আচার্য কৃপালনী কলোনি'। নানা কারণে গ্রন্থকার এই নামটি পরিবর্তনের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। বর্তমান নূতন সংস্করণে গ্রন্থকারের ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রন্থটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হল 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব'। এই নামের একটি ইতিবৃত্ত আছে—যা গ্রন্থকার তাঁর 'হে অরণ্য কথা কও'-এর এক স্থানে লিপিবদ্ধ করেছেন। নীলকরদের ইতিবৃত্ত নিয়ে গ্রন্থকার পরে তাঁর উপন্যাস 'ইছামতী'তে যে চিত্র দিয়েছেন, তা এর পূর্ণতর বিবরণ।

আরণ্যক :
ব্যারাকপুর—২৪ পরগণা
২৮ ভাদ্র ১৩৬৬

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বর

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে

দিলাম।

প্রীতিবদ্ধ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিন, ১৩৩৫

আচার্য কৃপালনী কলোনি

আমার স্ত্রী আমাকে কেবলই খোঁচাইতেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে বাড়ি। এই সময় জমি না কিনিলে পশ্চিমবঙ্গে ইহার পরে আর জমি পাওয়া যাইবে কি? কলিকাতায় জমি ও বাড়ি করিবার পয়সা আমাদের হাতে নাই, কিন্তু পনেরোই আগষ্টের পরে কলিকাতার কাছেই বা কোথায় জমি মিলিবে? যা করিবার এইবেলা করিতে হয়।

সুতরাং চারিদিকে জমি দেখিয়া বেড়াই। দমদমা, ইছাপুর, কাশীপুর, খড়দহ, ঢাকুরিয়া ইত্যাদি স্থানে। রোজ কাগজে দেখিতে-ছিলাম জমি ক্রয়-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। পূর্ববঙ্গ হইতে যে সব হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের অসহায় ও উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে বাড়ি ও জমির মালিকেরা একটুও বিলম্ব করেন নাই। এক বৎসর আগে যে জমি পঞ্চাশ টাকা বিঘা দরেও বিক্রয় হইত না সেই সব পাড়াগাঁয়ের জমির বর্তমান মূল্য সাত-আটশো টাকা কাঠা।

বহুস্থানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইলাম।

কলিকাতার খুব কাছাকাছি জমির দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে, আমাদের সাধ্য নাই ওসব স্থলে জমি কিনিবার। তাছাড়া জমি পছন্দই বা হয় কই?

এমন সময়ে আমার স্ত্রী একখানা কাগজ আনিয়া হাতে দিলেন। বলিলেন—তোমার তো জমি পছন্দই হয় না। ঠক্ বাছতে গাঁ উজোর করে ফেললে। সিনারি নেই তো কি হয়েছে? এটা পছন্দ হয় না, ওটা পছন্দ হয় না। এবার কি আর কিনতে পারবে

কোথাও ? যাও এটা দেখে এসো। খুব ভালো মনে হচ্ছে। তোমাব মনের মত। পড়ে ছ্যাখো—

আমাকে আমার স্ত্রী যাহাই ভাবুন, হিম হইয়া বসিয়া আমি নাই। সত্যিই খুঁজিতেছি, মন-প্রাণ দিয়াই খুঁজিতেছি। ভালো জিনিষ পাইলে আমার মত খুশী কেহই হইবে না।

বলিলাম—এ কাগজ কোথায় পেলে ?

—বীণাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরাও জমি খুঁজচে, ওদের দেশ থেকে সব উঠে আসচে ইদিকে, কলকাতার আশেপাশে। ওরা এটা কোথা থেকে আনিয়েচে।

পড়িয়া দেখিলাম। লেখা আছে—

'আচার্য কৃপালনী কলোনি।'

আজই আসুন ! দেখুন !! নাম রেজেষ্ট্রি করুন !!!

কলিকাতাব মাত্র কয়েক মাইল দূবে অমুক ষ্টেশনের সংলগ্ন সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে এই বিবাট নগরটি গড়িয়া উঠিতেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কলোনিব পাদদেশ ধৌত করিয়া স্বচ্ছ-সলিলা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছেন। পঞ্চাশ ফুট চওড়া বাস্তা, ইলেকট্রিক আলো, জলেব কল, স্কুল, মেয়েদের স্কুল, গ্রন্থাগার, নাগরিক জীবনেব সমস্ত সুখ-সুবিধাই এখানে পাওয়া যাইবে। আপাততঃ পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইলেই নাম বেজেষ্ট্রি কবিয়া রাখা হইবে।

ষ্টেশনেব নাম পড়িয়া মনে হইল, কলিকাতাব কাছেই বটে।

আমার স্ত্রী বলিলেন—দেখলে ? ভালো না ?

—খুব ভালো। বীণাব কাকা জমি নিয়েচেন এখানে ?

—না, নেবেন। নাম রেজেষ্ট্রি কবেচেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দাও। কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, জমি পরে দেখো। উনিও ত দেখেননি এখনো।

—জমি দেখবো না ? আচ্ছা, বীণার কাকাকে জিগ্যেস্ করি।

বীণার কাকার নাম চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। চিরকাল বিদেশে চাকুরী করিয়াছেন, কোথাও বাড়িঘর করেন নাই, জমি বাড়ি সম্বন্ধে খুব উৎসাহ। আগে-আগে ভাবিয়া আসিয়াছেন কলিকাতায় বাড়ি করিবেন, সম্প্রতি সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন।

চিন্তাহরণবাবু বলিলেন—আসুন। ও কাগজটা আপনি দেখেচেন? ভালো জায়গাই বলে মনে হ'চ্ছে।

—একটু দূরে হয়ে যাচ্ছে না কি?

—ওর চেয়ে কাছে আর পাবেন কোথায় মশাই?

—তা বটে। ষ্টেশনের কাছেই, গঙ্গার পারে।

—এখনো সস্তা আছে। এর পরে আর থাকবে না। ইলেকট্রিক আলো, জলের কল, পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তা—

—আপনি টাকা পাঠিয়েচেন?

—নিশ্চয়। রসিদ এসে গিয়েচে। আপনি যদি নেবার মত করেন তবে টাকা পাঠিয়ে দিন।

—জমি না দেখেই?

—ও মশাই, এইবেলা নাম রেজেষ্ট্রি করে রাখুন। এর পরে আর পাবেন না। ঠিকানাটা হচ্চে—দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট। রাজীব-নগর।

আমার স্ত্রী আমার নামের রসিদ দেখিয়া খুশী হইলেন। বলিলেন—কাঠা-পিছু পঞ্চাশ টাকা। ক' কাঠার জন্যে টাকা পাঠালে, মোটে দু'কাঠা?

—এখন এই থাক্। পনেরোই আগষ্ট কেটে যাক। সীমানা-কমিশনের রায় বের হোক। পরে—

পনেরোই আগষ্ট পার হইয়া গেল। সীমানা-কমিশনের রায় আর বাহির হয় না। আমার স্ত্রী বলিলেন—একবার জমিটা দেখে এসো না? বীণার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে যাও—অনেক লোক আসচে

ময়মনসিং পাবনা নোয়াখালি থেকে পালিয়ে। আমাদের পাশের বাড়ির ফ্লাট্‌গুলো সব বোঝাই। এক-এক গেরস্ত বাড়িতে তিন-চার ঘর লোক আশ্রয় নিচ্চে।

—কেন নিচ্চে ? কোথাও তো কোনো গোলমাল নেই।

—তা কি জানি বাপু, অত-শত জিগ্যেস্ করেচে কে ? বীণাদের বাড়িই ওর পিসতুতো ভাই আর বীণার দাদামশায়ের ছোট ভাই এসেচেন ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কথাটা মন্দ নয়। নাম রেজেষ্ট্রি করিয়াছি, জমি কোথাও যাইবে না। তবে আর এক-আধ কাঠা বেশী জমি রাখিব কি না, ইহাই ধার্য করিবার পূর্বে কলোনিটা একবার চোখে দেখা উচিত নয় কি ?

সন্ধ্যার সময় ঝড়ের বেগে বীণার কাকা আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলাম—ব্যাপার কি ? এত ব্যস্ত কেন ?

—নিয়ে নিন, নিয়ে নিন। জমি কোথাও এতটুকু পাওয়া যাবে না এর পরে। হাজার হাজার লোক আসচে 'ইষ্টবেঙ্গল' থেকে। আমার বাড়ি তো ভর্তি হয়ে গেল। জমি এইবেলা যা যেখানে নেবার নিয়ে নিন।

—বলেন কি ?

—সত্যি বলচি। কলোনির জমিটা চলুন কাল দেখে আসি। দেখে এসে কিছু বেশী করে জমি ওখানেই কিনে রাখুন। কত করে দাম নেবে তা কিন্তু এখনো বলেনি। কাল সেটাও ওদের আপিস থেকে জেনে আসি চলুন—

—কোথায় যেন ওদের আপিস ?

—রাজীবনগর। কোন্নগরের কাছে।

পরদিন কিন্তু আমাকে একাই যাইতে হইল।

বীণার কাকা যাইতে পারিলেন না, তাঁহার বাড়িতে আবার দুটি গৃহস্থ আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কোন্নগর ষ্টেশনে নামিয়া রাজীবনগর যাইতে মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। ষ্টেশনের সংলগ্ন তো নয়ই। পাকা আড়াই মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তা কাদায় ভর্তি। যেমন জঙ্গল, তেমনি মশা।

খোঁজ করিয়া এক গ্রাম্য ডাক্তারবাবুকে জমির মালিক হিসাবে পাওয়া গেল। তিনি একখানা টিনের ঘরে রোগীপত্র দেখিতেছিলেন, যাহাদের সংখ্যা আর ডাক্তারের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু নহে। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকে চাচ্চেন ?

বিনীতভাবে বলিলাম—আপনারই নাম, মনীন্দ্র ঘটক ? আমি যশোর থেকে আসচি ; আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

ডাক্তারবাবু নিস্পৃহভাবে বলিলেন—ও—

এর পরক্ষণেই রোগীদের দিকে মনোযোগ দিলেন পুনরায়।

আমি বড় আশা করিয়াই গিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে মাত্র নয় মাইল দূরে ষ্টেশনের গায়ে জমি, এ জমিটা লইতে পারিলে নানাদিক দিয়াই সুবিধা। কিন্তু জমির মালিক অত নিস্পৃহ কেন ? তবে কি বিক্রয় করিবেন না স্থির করিলেন ?

প্রায় মিনিট দশেক কাটিয়া গেল।

দাঁড়াইয়াই আছি। কেউ বসিতেও বলে না।

আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলাম—আমি—মানে, এই ট্রেনেই আবার—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি বলচেন ?

—জমিটা—

—কোন্ জমি ?

—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—ষ্টেশনের সংলগ্ন—কৃপালনী কলোনি—

—ও—

আবার রোগীদিগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। আমিও

অতটা সুবিধাসম্পন্ন যে জমিটুকু, তাহার খোদ মালিককে বিরক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

দশ মিনিট কাটিল।

এবার ডাক্তারবাবুই আমাকে বলিলেন—তা, বসুন।

বসিবার অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। অনেকক্ষণ হইতে খাড়া দাঁড়াইয়া আছি। বসিবার মিনিট দুই পরে আমি বলিলাম—ইয়ে—জমিটার কথা—মানে—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি বলচেন ?

—জমিটার কথা বলছিলাম। মানে—একবার দেখলে ভালো হয়। এদিকে বেলা হয়ে যাবে—

—জমিটা দেখবেন ? ও কার্তিক, কার্তিক ! যাও, এই বাবুকে জমিটা দেখিয়ে আনো।

ভাবিলাম, তাইতো ইহা আবার কি। ডাক্তারখানার পাশের ঘরে বড়-বড় হরফে ইংরাজীতে লেখা আছে বটে, 'দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট'।

গঙ্গার ধারে বিরাট ভূখণ্ড লইয়া এই উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবে—কিন্তু গঙ্গা হইতে বাজীবনগরই তো দেখিতেছি আড়াই মাইল দূরে। তবে ইহাও হইতে পারে, দি নিউ ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ট্রাষ্টের আপিস এখানে, জমি গঙ্গার ধারে।

কার্তিক নামধেয় লোকটি ডাক্তারবাবুর আহ্বানে এইমাত্র আসিয়াছিল। বলিল—কোন্ জমি বাবু ?

—আরে, ওই যে বারোজের পশ্চিম গায়ে—

—জমি ?

—আ মলো যা। হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? হাঁ, জমি। কোথাকার ভূত ?

বাড়ির চাকরটা বোধ হয় বোকা, প্রভুর এমন মূল্যবান ভালো বহু-বিজ্ঞাপিত ভূমিখণ্ডের সম্বন্ধে কোন খবর রাখে না কেন ?

আমি পথে বাহির হইয়া বলিলাম—চলো—

লোকটা পশ্চিমদিকে যাইতেছে দেখিয়া বলিলাম—ওদিকে কোথায় যাচ্চো ? ইষ্টিশানের কাছে যে জমি—কৃপালনী কলোনি—

—ইষ্টিশানের কাছে কোনো জমি নেই বাবু।

—আলবৎ আছে। তুমি কোনো খবর রাখো না।

—না বাবু, কোনো জমি নেই ওদিকে।

—শোনো। ইষ্টিশানের গায়ে। কাগজে যে জমির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে নাম রেজেষ্ট্রি করতে বলা হয়েছিল যে জমির জন্যে। আমি নাম রেজেষ্ট্রি করে রেখেছি—রসিদ আছে পকেটে—

—এ-কথাটা আপনি ওখানে বল্লেন না কেন বাবু। আমি তো আর কোনো জমির সন্ধান জানি না। কালও তো এক বাবু এসেছিলেন, তিনিও নাম রিজিষ্টারি করে নিয়ে গেলেন।

—জমি দেখেননি ?

—না। ডাক্তারবাবু বল্লেন, জমি দেখে যাবেন সামনের রবিবারে।

—বেশ, আমায় নিয়ে চলো—

—বাবু—

—কি বলে আবার ?

—আপনি জমি দেখতে চান ?

—কি বলে আবোল-তাবোল ? জমি দেখবো না তো কি ?

—আপনি এখানে দাঁড়ান। আমি জিগ্যেস্ করে আসি।

আমি বিরক্ত হয়ে নিজেই আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। বলিলাম—আপনার চাকর জানে না আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে।

এবার ডাক্তারবাবু দেখিলাম, আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনিও জমির জন্যই আসিয়াছেন মনে হইল। কারণ

তিনি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া নাম রেজেষ্ট্রি করিলেন। ডাক্তারবাবু রসিদ কাটিয়া দিলেন দেখিলাম। লোকটির সঙ্গে আরো কি কথা হইয়াছে জানি না, দুটাকা দিয়া রসিদ লইয়া লোকটা চলিয়া গেল।

আমাকে ডাক্তারবাবু বলিলেন—জমি দেখবেন? আচ্ছা, চলুন আমিই যাচ্ছি।

পরে আমাকে দুর্গন্ধময় জল-ভর্তি নালা, কচুবন, ভাঙা চালাঘর প্রভৃতির পাশ দিয়া কোথায় কোন্ অনির্দেশ্য রহস্যের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন, তিনিই জানেন।

আমি একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলাম। তিনি বোধ হয় ভুলিয়া যাইতেছেন, এ জায়গাটি ষ্টেশনের খুব কাছে। ষ্টেশনের সংলগ্ন বলিয়া বিজ্ঞাপনে আছে—

ডাক্তারবাবু আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—আপনার তো আইডিয়া দেখছি বেশ। ষ্টেশন-সংলগ্ন মানে কি একেবারে কোন্নগর ইষ্টিশানের টিকিটঘরের পাশে হবে মশাই?

বলিতে পারিতাম, 'সংলগ্ন' বলিতে দুই মাইল দূরবর্তীই কি বোঝায়? কিন্তু না, দরকার নাই। পূর্ববঙ্গের অসহায় হিন্দু আমি, এখানকার জমির মালিকের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করিব না। স্থান পাওয়া লইয়া কথা। চটিয়া গেলে জমি না দিতেও তো পারে।

বিনীতভাবে বলিলাম—কলোনি কতদূর?

—মাইলখানেক দূরে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—বলেন কি! তবে সাড়ে-তিন মাইল দূর পড়লো ষ্টেশন থেকে। এর নাম 'সংলগ্ন'? এ তো কখনো শুনিনি—

ডাক্তারবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বলিলেন—না শুনেচেন কি করবো? কিন্তু আপনাকে বলচি, কলোনির এক ইঞ্চি জমি পড়ে থাকবে না। সব নামে-নামে রেজেষ্ট্রি হয়ে যাচ্চে। আপনার ইচ্ছে হয়, না নেবেন। তবে কি দেখতে যাবেন, না, দেখবেন না?

—চলুন যাই।

পকেট হইতে একগোছা চাবি বাহির করিয়া ডাক্তারবাবু আমার নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন—এই দেখুন। মনিঅর্ডারে টাকা আসচে অফিসে, রোজ একগোছা চিঠি আসচে, আপনি দেখুন না মশাই। না দেখলে ঠকবেন এর পরে। তবে আপনি না নিলে জোর করে তো আপনাকে দেওয়া হবে না—

রাস্তায় ভীষণ কাদা। একটা গোয়ালা-পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, মহিষ ও গরুর বাথান চারিদিকে। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাতাসে। ইহাতে মশা বিন্-বিন্ করিতেছে। খানিকদূর গিয়া একটা অবাঙালী কুলির বস্তি, যেমন নোংরা, তেমনি ঘিঞ্জি। তারপরে আবার জঙ্গল, বাঁশবন আর ডোবা।

মাইলখানেক দূরে জঙ্গলের একপাশে রাস্তার ধারে একটা টিনের সাইনবোর্ডে বড়-বড় করিয়া লেখা আছে—'আচার্য কৃপালনী কলোনি'।

এখানে আসিয়া ডাক্তারবাবু দাঁড়াইলেন। সামনের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—এই—

চারিদিক চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ময়বোধের শক্তিও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহারই নাম, আচার্য কৃপালনী কলোনি? এই সেই বহু-বিজ্ঞাপিত ভূখণ্ড? কোথায় ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে? কোথায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য? পঞ্চাশফুট চওড়া রাস্তা, ইলেক্‌ট্রিক আলো, জলের কল প্রভৃতি ছবির সঙ্গে এই অন্ধকার বাঁশবন, কচুবন, ওলবন আর মশাভরা ডোবার খাপ খাওয়াইতে অনেক চেষ্টা করিলাম; মনকে অনেক বুঝাইলাম, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কি ছিল? অমুক কি ছিল? কিন্তু পারিয়া উঠিলাম না। তাহা ছাড়া এখানে ডাঙ্গা-জমিই বা কোথায়? সব তো জলে-ডোবা আর জলের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে বনকচুর ঝাড়।

সে কথা বলিয়া লাভ নাই।

ডাক্তারবাবু গর্বের সহিত বলিলেন—সাড়ে-ছ'শো করে কাঠা, তাই পড়তে পারচে না। সব প্লটের নাম রেজেষ্ট্রি হয়ে গিয়েচে মশাই।

কিন্তু 'প্লট' বলিতে জমির টুকরা বোঝায়, এখানে জমি যে নাই, এ তো সবই জলাভূমি। পুণ্যতোয়া স্বচ্ছসলিলা জাহ্নবী ইহার ত্রিসীমানায় আছেন বলিয়া মনে হইল না।

বলিলাম—গঙ্গা এখান থেকে কতদূর?

—বেশী নয়। মাইলখানেক হবে কিংবা কিছু বেশী হবে—

তাই-বা কি করিয়া হয়? গঙ্গা এখান হইতে চারি মাইলের কম কি করিয়া হয়, বুঝিলাম না।

সে যাহা হউক, তর্ক করিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। ওই জলাভূমি আর কচুবনই হয় তো ইহার পর পাইব কিনা কে জানে। মন ভীষণ খারাপ হইয়া গেল।

বাড়ি আসিতেই স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ গা, কি রকম দেখলে? ভালো?

বলিলাম—চমৎকার!

—বলো না, কি রকম জায়গা? গঙ্গার ওপর?

—সংলগ্ন বলা যেতে পারে।

—বেশ বড় রাস্তা করেচে?

—মন্দ নয়। বড়ই।

বীণার কাকাকে সেদিন কিছু বলিলাম না। পঞ্চাশ টাকা জলে ফেলিলাম বটে, কিন্তু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পূর্ববঙ্গই ভালো। আর জমি খুঁজিব না ঠিক করিয়া ফেলিলাম।

পরদিন র‍্যাডক্লিফের রায় বাহির হইল।

আমাদের দেশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে।

নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব

সাহেবের নাম এন. এ. ফারমুর। নীলগঞ্জের নীল কুঠীয়াল সাহেবদের বর্তমান বংশধর। আমি বাল্যকাল হইতেই সাহেবকে চিনি। যখন স্কুলে পড়ি, সাহেবদের কুঠীতে একবার বেড়াইতে যাই। ফারমুর সাহেবকে এদেশের লোক ফালমন্ সাহেব বলিয়া ডাকে। আমার বাল্যকালে ফালমন্ সাহেবের বয়স ছিল কত? পঞ্চাশ হইবে মনে হয়। সাহেবদের কুঠীতে যাইয়া দেখিতাম সাহেব দুধ দোয়াইতেছেন। অনেকগুলি বড় বড় গাই ছিল কুঠীতে, বিশ ত্রিশ সের দুধ হইত। নৌকা করিয়া প্রতিদিন ওই দুধ মহকুমার সহরে প্রেরিত হইত। আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমাকে দেখিয়া বলিতেন—সকাল-বেলাতেই এসে জুটলে? খাবা কিছু?

—খাবো।

—কি খাবা? দুধ?

—যা দেবেন।

—ও মতি, ছেলেটিকে গুড় দিয়ে মুড়ি দাও আর দু' উড়কি দুধ দাও।—আমি এই মাত্তর খেয়ে আলাম—বোসো খোকা, বোসো।

নীলকুঠীর আমলে ফালমন্ সাহেবের বাবা লালমন্ (লালমুর) সাহেবের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এদেশে। নীল চাষ উঠিয়া যাইবার পরে বিস্তৃত জমিদারীর মালিক হইয়া এ দেশেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। ক্রমে জমিদারীও চলিয়া যায় অনেক, লালমন্ সাহেবও মারা যান। ফালমন্ বিস্তৃত আউশ ও আমন ধানের জমি চাষ করিতে থাকেন, বড় বড় গরু পুষিতেন, সেই সঙ্গে হাঁস, মুরগী, ছাগল ও ভেড়া। সাহেবের কুঠীতে সারি সারি ধানের গোলা ছিল বিশ-

ত্রিশটা। জমিদারীও ছিল, কুঠীর পূবদিকের বড় হলদে ঘরে (যার সামনে বেগুনি প্যাটেন ফুলের প্রকাণ্ড গাছ, কি ফুল জানি না, আমরা বলিতাম 'প্যাটেন' ফুল) কুঠীয়াল সাহেবের নায়েব ষড়ানন বক্সি কাছারি করিতেন, এবং প্রজাপত্র ঠেঙ্গাইতেন। লালমন্ সাহেব কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারিব না, তবে তাঁহার বৈঠকখানায় একখানা বড় ছবির তলায় লেখা ছিল "T. Farmour of Bournemouth, England." ফালমনের জন্ম নীলগঞ্জেই। তাঁহাদের সকলেই যশোর জেলার পাড়াগাঁয়ের কৃষকশ্রেণীর ভাষায় কথা বলিতেন।

—কি পড়ো ?

—মাইনর সেকেন্ ক্লাসে।

—ইউ, পি, পাশ করেচ ?

—হ্যাঁ।

—বিত্তি পেয়েছিলে ?

—না।

—আমার ইস্কুলে পড়ো ?

—আপনার ইস্কুলে না। জেলাবোর্ডের স্কুলে, চেতলমাবির হাটতলায়।

—ও বুঝিচি। তবে তোমার বাড়ী এখানে না ?

—আজ্ঞে না। আমার পিসির বাড়ী এখানে।

—কেডা তোমার পিসে ?

—ভূষণচন্দ্র মজুমদার।

—[illegible] মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী এসেচ তুমি ? বেশ বেশ, নাম কি

—শ্রীরতনলাল চক্রবর্তী।

—পিতার নাম ?

—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

—তুমি মাখনলাল মাষ্টারের ছেলে ? চেতলমারির ইস্কুলির ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই বলো। মাখন মাষ্টার তো আমাদের বন্ধু লোক। বেশ, বসো, দুধ দিয়ে মুড়ির ফলার ক'রে খাও।

ফালমন্ সাহেবের সঙ্গে এই ভাবেই আলাপ সুরু। তা' বাদে মাঝে মাঝে সাহেবকে চিতলমারির খড়ের মাঠে আমীনকে সঙ্গে লইয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। কতদিন নৌকায় লোকের সাহায্যে পটল কুমড়ো বোঝাই করিতে দেখিয়াছি। লম্বা একহারা সাহেবী চেহারা। ভুঁড়ি একদম নাই, গায়ে এক আউন্স চর্বি নাই কোথাও। গোঁফ জোড়াটা বড্ড লম্বা, দৃঢ় চোয়াল সবই ঠিক সাহেবী ধরনের। কিন্তু পোষাকটা সব সময় সাহেবের মত নয়, কখনো ধুতি, কখনো কোটপ্যান্টের উপর মাথায় তালপাতার টোকা। শেষোক্ত বেশটা দেখা যাইত যখন ফালমন্ মাঠের চাষবাসের তদারক করিতেন। কৃষাণ ছিল সংখ্যায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, লাঙ্গল গরু চল্লিশখানা, আট দশখানা গরুর গাড়ি। অত বড় ফলাও চাষ সাধারণ কোনো বাঙালী গৃহস্থ চাষী কল্পনাও করিতে পারে না। তালপাতার টোকা মাথায় কৃষকদের কাজকর্ম দেখাশোনা করিতেন বটে, কিন্তু হুঁকোয় তামাক খাইতে কখনো দেখি নাই—পাইপ সর্বদা মুখে লাগিয়াই থাকিত। কৃষাণদের বলিতেন—বাবলাতলার জমিগুলোন্‌তে দোয়ার (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার চাষ) দেবা কবে ও সোনাই মণ্ডল ? তা ছ্যাও। আর দেরি করবা না। রস টেনে গেলি ঘাস বেধে যাবে আনে। তখন লাঙ্গল বেশী লাগবে। এখনো ভুঁইতে রস আছে। সোনাই মণ্ডল হয়তো বলিল—বাবলাতলার ভুঁইতে পানি আর কনে, সায়েব ? কে ব[illegible] আপনারে ?

—নেই ? কাল সাঁজের বেলা আমি আর প্যাট্ (সাহেবের শালা, এখানেই বরাবর থাকিত দেখিতাম, চাষবাসের কাজ দেখে) যাইনি বুঝি ? ঝা পানি আছে তাতে কাজ চলে যাবে আনে।

—ছোলা কাটতি হবে এবার।

—এখনো দানা পুরুষ্ট হয়নি, আর চার পাঁচটে রোদ খাক্। সময় হলি ব-অ-ল-বো—

এই সময় নদীপপুরের গোপেশ্বর বৈরাগীকে মাঠের পাশের পথ দিয়া মাথার টোকাটা কপালের উপর দুই আঙ্গুল দিয়া একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিলেন—ও গোপেশ্বর—শোনো—গোপেশ্বর—

গোপেশ্বর আসিয়া বলিল—সেলাম সায়েব—

সাহেবের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এ অঞ্চলে, কারণ অধিকাংশই তাহার প্রজা।

—যাচ্চ কনে ?

—যাবো একবার পানচিতে। মেয়ের খবর পাইনি অনেক দিন। জামাইডা কেমন আছে দেখে আসি, পেট জোড়া পিলে তার। গত অঘ্রান মাসে যায় যায় হইছিল—

—ম্যালেরিয়া ?

—তা আমরা কি বুঝি ? তাই হবে।

—বেশ। একটা কৃষ্ট বিষয় গান করে শুনিয়ে যাও দিকি ?

—কৃষ্ট বিষয় ?

—কিংবা শ্যামা বিষয়। না, তুমি বোষ্টম টুম টুম আবার বুঝি শ্যামা বিষয় গাইবা না। ঝা মন চায় একখানা শোনাও। বড্ড রোদ পড়চে, শরীলির কষ্ট হয়েচে বড্ড। বোসো, এই পিটুলিতলায় ছাওয়া পানে।

গোপেশ্বর গান গাহিতে বসিয়া দুবার কাশিল, সাহেবের দিকে লাজুক দৃষ্টিতে দু' একবার চাহিয়া পরে গান আরম্ভ করিল—

[illegible]নটি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে—

ফালমন্ সাহেব হাতে তালি দিতে দিতে বলিলেন—বাঃ বাঃ—বেশ গলা—দাশুরায় না নীলকণ্ঠ ?

—নীলকণ্ঠ।

—দাশুরায় একখানা হোক না ?

সাহেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এ অঞ্চলে, সুতরাং গোপেশ্বরকে আর একখানা গান গাহিতেই হইল।

ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে অকূল যমুনা।
কূলে বসে দুনয়নে বারি ঝরে
কোলে অকূলের কাণ্ডারী তাও জানে না।
একবার ভাব যদি ধর্তমান কংসের পদে
দৈবে দয়া যদি হোত পাষাণ হৃদে—
তা হয় না আর
গেল একূল ওকূল দুকূল
অকূল পারে গোকুল
কূলের তিলক রাখতে কূল পেলেম না।
ভয়ে আকুল বসুদেব
দেখে অকূল যমুনা—

ফালমন্ সাহেব চক্ষু মুদিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গান শুনিতেছিলেন। আবার গোপেশ্বরের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ—দাশুরায়ের গানের কাছে আর-সব কিছু লাগে না। কি রগম—কি-ওরে বলে গোপেশ্বর ?

—অনুপ্রাস ?

—ওই যা বল্লে। ভারি চমৎকার, লাগতিই হবে যে। দাশুরায় হুঁঃ—

—আজ উঠি সাহেব।

—আচ্ছা এসো—

ফালমন্ সাহেবের কাছারি ঘরে—রাম শ্যামকে মারিয়াছে, শ্যামের গরু যদুর পটলের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে—এই সব গ্রাম্য মামলার বিচার হতো। বিচার সাধারণতঃ করিত নায়েব ষড়ানন বক্সি, গুরুতর মোকর্দমায় ফালমন্ সাহেব নিজে বিচারাসনে বসিতেন।

আমি দেখিয়াছিলাম যে দিন গুড়ে জেলের ভাই-বৌ রেমো ধোপার ছেলে অতুলের সঙ্গে সোজা চম্পট দেওয়ার পরে আড়ংঘাটা ষ্টেশনে ধরা পড়িয়া পুনরায় গ্রামে আনীত হইল, সেদিন ফালমন্ সাহেবের বিচার। গ্রামে হৈ চৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ দু'দশ বছরে এই ধরনের ব্যাপার কেহ এ অঞ্চলে দেখে নাই, শোনেও নাই।

ফালমন্ সাহেব অতুলকে কড়া স্বরে প্রশ্ন করিলেন—জেলে-বৌয়ের বয়সটা কত ?

অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—তা জানিনে সাহেব।

—তোমার চেয়ে বড় না ছোট ?

—আমার চেয়ে বড়।

—তোমার বয়েস কত ?

—আজ্ঞে, এই তেইশ।

রেমো ধোপার দিকে চাহিয়া সাহেব বলিলেন—এই রেমো, বয়েস ঠিক বলচে তো ?

রেমো বলিল—হাঁ, সাহেব।

—আর জেলে-বৌয়ের বয়েস কত ?

গুড়ে জেলে বলিল—আজ্ঞে, বত্রিশ।

—বত্রিশ ?

—আজ্ঞে।

সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে অতুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোর বড় দিদির বয়সী যে-রে হারামজাদা—তোর লঘু-গুরু জ্ঞান নেই ? মারো দশ জুতো সকলের সামনে—আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, যাও—

ব্যস্, বিচার শেষ।

আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ বা ওকালতি খাটিবে না।

The great Khan has spoken—মিটিয়া গেল।

সেকালের নীলকুঠীর অটোক্র্যাট্ ভূম্যধিকারীর রক্ত ছিল ফালমন্ সাহেবের গায়ে, প্রজা পীড়ন ও শোষণে তিনি তেমনি পটু, তবে যুগ-প্রভাবে নখ-দন্ত অপেক্ষাকৃত ভোঁতা—এইমাত্র।

সেবার মস্ত বড় দাঙ্গা বাধিল বাগদী ও জেলে প্রজাদের মাৎলার বিলের দখল লইয়া। মাৎলার বিল বরাবর বাগদী প্রজাদের কাছে বন্দোবস্ত করা ছিল রানী রাসমণি এষ্টেটের স্বরূপনগর কাছারী থেকে। কখনো এক পয়সা খাজনা আদায় হইত না। মামলা মোকর্দমা করেও কিছু হয় না—তখন রানী এষ্টেটের নায়েব ভৈরব চক্রবর্তী মাৎলার বিল দশ বৎসরের জন্য ইজারা দিলেন ফালমন্ সাহেবকে। সেলামি এক পয়সাও নয়, কেবল শালিয়ানা আড়াইশো টাকা খাজনা। কারণ দুর্ধর্ষ জেলে ও বাগদী প্রজাদের কাছ থেকে বিলের দখল পাওয়াই ছিল সমস্যা—সাহেবের দ্বারা সে সমস্যা পূরণ হইবে, ভৈরব চক্রবর্তীর এ আশা ছিল এবং সে আশা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয় বিল ইজারা দেওয়ার এক পক্ষ কালের মধ্যেই পদ্মফোটা মাৎলা বিলের রক্ত-রঞ্জিত জল তার প্রমাণ দিল। প্রকাশ ফালমন্ সাহেব স্বয়ং টোকা মাথায় দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দাঙ্গা পরিচালনা করিয়াছিলেন। যদিও পুলিশ রিপোর্টে পরে প্রকাশ হইল, দাঙ্গার সময় ফালমন্ সাহেব তাঁর বড় মেয়ে মার্জারির টন্‌সিল অস্ত্র করিবার জন্যে তাহাকে লইয়া কৃষ্ণনগর মিশন হাসপাতালে যান।

মামলাবাজ ও-ধরনের আর একটি লোক সারা জেলা খুঁজিলে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

প্রায়ই মহকুমায় মামলা থাকিত।

সাহেবের চারদাঁড়ের ডিঙি সাতটার সময় ছাড়িত কুঠিঘাট থেকে। ছইয়ের মধ্যে ফালমন্ সাহেব ও তাঁর খাওয়ার জন্যে ফলের ঝুড়ি, জলের কুঁজো, দুধের বোতল, নায়েব ষড়ানন বাবু ও তাঁর বিছানাপত্র, দুজন মাঝি (তার মধ্যে একজনের নাম গোপাল পাইক, জাতে বাগদী, খুব ভাল গান গাহিতে পারে)—এই লইয়া

তীরবেগে নৌকা ছুটিত দশ মাইল দূরবর্তী মহকুমার সহরের দিকে। হু হু করিয়া মুখোড় বাতাস বহিত। গাঙে সাহেবের প্রিয় অনুচর গোপাল পাইক প্রভুর ইঙ্গিতে নৌকার গলুইয়ের কাছ থেকে ছইয়ের কাছে সরিয়া আসিত। সাহেব বলিতেন—একটা কৃষ্ণ বিষয় কিংবা শ্যামা বিষয় গাও গোপাল—

গোপাল অমনি ধরিত—

নীল বরণী নবীনা রমণী নাগিনী জড়িত জটা সুশোভিনী
নীল নয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী—

তারপর গাহিত—

কি কর কি কর শ্যাম নটবর, ছাড় যাই নিজ কাজে—

গোপাল পাইক যাত্রাদলে অল্প বয়সে গাহিত, সাহেবের সঙ্গীত-প্রিয়তার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ পুরস্কার আশায় একদিন সে নীলগঞ্জের কুঠীতে গাহিতে আসে—গান শুনিয়া সাহেবের বড় ভাল লাগিল এবং সেই হইতে গোপাল সাহেবের এষ্টেটের চাকুরীতে বহাল হইয়া গেল।

এক পয়সা খাজনা বাকি থাকিলেও যেমন সাহেবের এষ্টেট হইতে নালিশ হইত, আবার ধরিয়া পড়িলে ক্ষমা করিতেও ফালমন্ সাহেব ছিলেন বিশেষ পটু। কতবার এরকম হইয়াছে। দুর্বুদ্ধি প্রজা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কিংবা উকিল মোক্তারদের উৎসাহে নীলগঞ্জ এষ্টেটের বিরুদ্ধে মামলা লড়িয়াছে। একবার ফৌজদারী, তারপর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী দেওয়ানী, মহকুমা হইতে সব্-জজকোর্ট, সেখান হইতে আবার পুনর্বিচারের জন্য মহকুমার মুন্সেফকোর্ট—এই করিতে করিতে প্রজা এষ্টেটকে হয়রান করিয়া এবং নিজেও সর্বস্বান্ত হইয়া যখন জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিল, তখন হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টের বটতলাতেই একেবারে ফালমন্ সাহেবের পা জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল পায়ে।

—আরে কি কি কি?

—আজ্ঞে আমি মুকুন্দ বিশ্বেস।

সাহেব পায়ের ঝটকা মারিয়া বলিলেন—বেরো হারামজাদা—বেরো—বেরো—

ফালমন্ হিন্দী কথাই জানিতেন না, খাঁটি বাংলা ইডিয়মযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সে শুধু এইজন্য যে নীলগঞ্জের কুঠীই তাঁহার জন্মস্থান, এই গ্রাম্য আম জাম নিকুঞ্জ ছায়ার শ্যামলতায় ও কৃষকদের সাহচর্যে তিনি আবাল্য লালিত পালিত ও বর্ধিত। ডরসেট সায়ারের ইংরাজরক্ত ধমনীতে থাকিলেও মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী, ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চিন্ত শান্তি ও আলস্যের মধ্যে যাঁহার যৌবন কাটিয়াছে, সেই স্বচ্ছল বাঙালী জমিদার। মুকুন্দ বিশ্বাস ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিতে লোক ছুটিয়া ভিড় বাধাইল। সকলেই ভাবিল সাহেব কি অত্যাচারী! গরীব প্রজাকে কি করিয়া পীড়ন করিতেছে দ্যাখো। একেবারে এইভাবেই সর্বস্বান্ত করিতে হয়? ছিঃ—

কেহ বুঝিল না কিরূপ তের্দড় ও দুঁদে প্রজা মুকুন্দ কলু।

—কি চাই? কি?

—সাহেব মা বাপ—ধরম বাপ—মোরে বাঁচাও ধরম বাপ—

—কেমন? মোকদ্দমা করবিনে? কর ছানি—শোন-চোন ও হরিশ বাবু শোনেন—ই দিকে।

চোগা চাপকান্ পরনে বড় উকিল হরিশ্চন্দ্র গাঙ্গুলী ঘটনাস্থলের কিছু দূর দিয়া যাইতেছিলেন। সাহেবের আহ্বানে নিকটে আসিতে আসিতে বলিলেন—গুড্ মর্ণিং মিঃ ফারমুর, বলি ব্যাপার কি?

—আর দ্যাখেন না কাণ্ডখানা। চেনেন না মুকুন্দ বিশ্বাসকে? পাচপোতার মুকুন্দ বিশ্বাস। বদমায়েসের নাজির, ওর বদমায়েসী দেখতে দেখতে মাথার চুল আমি পাকিয়ে ফ্যাললাম হরিশবাবু, ওরে আর আমি চিনিনে? শুনুন তবে—আরে নায়েব মশায়, বলুন দিকি সব খুলে—

সব শুনিয়া হরিশ বাবু মুকুন্দ কলুকে ধমক দিয়া কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিলেন। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা! তাহার মত ট্যানাপরা লোকের পক্ষে? যাক্, যাহা হইবার হইয়াছে, সাহেব, নিজগুণে এবারটি গরীবকে মাপ করিয়া দিন।

সাহেবকে হরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ বুঝি ডিক্রির দিন?

—নিশ্চয়। ও এতদিন আমার সঙ্গে একটা কথা কইতো না। আজ একেবারে পায়ে ধরেছে।

ষড়ানন বক্‌সি বলিল—শুধু পায়ে ধরা নয় একেবারে মড়াকান্না কেঁদে লোক জড়ো করে ফেলেছে—

সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—এই, যাও সব এখান থেকে। এখানে কি? চলে যাও সব—

হরিশ বাবু উকিলও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, তোমরা কেন এখানে বাপু? কাছারির সামনে ভিড় কোরো না—হাকিম চটবেন—যাও এখন—এখানে কি ঠাকুর উঠেছে?

হিসাব করিয়া ষড়ানন বক্‌সি সাহেবকে জানাইল, এই মামলায় এ পর্যন্ত সাতশো সাড়ে-সাতশো টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

সাহেব বলিলেন—আচ্ছা যা, মাপ করলাম। নায়েব বাবু মামলা মিটিয়ে নেবেন।

ষড়ানন বক্‌সি বলিল—খরচার টাকা?

—ওর সঙ্গে না হয় ষড় করে নেবেন। তবে বলে দিন আমার কুঠীতে গিয়ে নাকে খত দিতে হবে ওকে। নইলি আমি ওকে ছাড়বো না। ও নাকে খত দিতে রাজি কিনা?

মুকুন্দ বিশ্বাস খুব রাজি। সে এখনি নাকে খত দিতে প্রস্তুত আছে। সাহেবের আশ্বাস পাইয়া সে চলিয়া গেল।

সেবার শীতকালের মাঝামাঝি মিসেস্ ফালমন্ লিভারের অসুখে ভুগিয়া কলিকাতার হাসপাতালে মারা গেলেন। দিন সাতেক পরে

নীলগঞ্জের চারিপাশের পাঁচ ছয় খানি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদিগের তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল—মেম সাহেবের আত্মার মঙ্গল কামনায় যদি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হয়, তাঁহারা খাইবেন কিনা। তখনকার দিনে এসব ধরনের খাওয়ায় সামাজিক কড়াকড়ি অনেক বেশী ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদের রাজি না হইয়া এক্ষেত্রে উপায় ছিল না। সাহেবকে চটাইতে কেহই রাজি নয়।

নীলগঞ্জের কাছারি ঘরের সামনে তুঁততলায় দু'দিন ধরিয়া কালী ময়রা সন্দেশ, বঁদে, পানতুয়া ভিয়ান করিল। কাছারি বাড়ির হলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের যে বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছিল, এ অঞ্চলে সে রকম খাওয়ানো কখনো কেহ দেখে নাই।

ফালমন্ সাহেব কুঠীর গেটে নিজে দাঁড়াইয়া প্রত্যেককে বলিতে-ছিলেন—পেট আপনাদের ভরেছে? কষ্ট দেলাম আপনাদের এনে। কিছু মনে করবেন না—

আমিও সে দলে ছিলাম, তখন স্কুলের বালক, ভূরিভোজন করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম। দীর্ঘাকৃতি ফালমন্ সাহেবের সে বিনীত মুখভাব, সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয় দৃষ্টি এখনো মনে আছে। মানবতার উদার গতিপথের পার্শ্বে অবস্থিত এই ছবিখানি আজকার এই হিংসা দ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্বের দিনে বেশী করিয়া স্মরণে উদিত হয়।

বারোয়ারি যাত্রার আসরে ফালমন্ সাহেব সকলের সামনে চেয়ার পেতে বসতেন। যাত্রা গানের অমন ভক্ত দুটি দেখা যেত না।

—ও বেয়ালাদার, একটা এ'কালে গৎ ধরো বাবা—জুড়িদের এগিয়ে দাও—

সাহেবের ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে যাত্রাদলের গাইয়ে বাজিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

আর কৃষ্ণ সাজিয়া আসিয়া গান ধরিলেই হইল, অমনি মেডেল ঘোষণা।

সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবেনই—এই যে ছোঁড়াডা কৃষ্ট সেজে এসে গানখানা করে গেল, ওরে আমি একটা রুপোর মেডেল দেবো—কথা শেষ করিয়াই চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিমুখে চাহিয়া বলিতেন—হাততালি—হাততালি—

অমনি চট্‌পট্‌ করিয়া চতুর্দিকে হাততালি পড়িবে। নিজে সকলের আগে হাততালি দিবেন।

কোন করুণ ভক্তিরসের ব্যাপার ঘটিলে সাহেব সকলের সঙ্গে 'হরিবোল' দিয়া উঠিবেন। বারোয়ারীতে চাঁদা দিতে সাহেব যেমন মুক্তহস্ত, তেমনি রক্ষাকালীপূজা বা শীতলাপূজার অনুষ্ঠানে। তখনকার দিনে বারোয়ারি দুর্গাপূজা বা শ্যামাপূজার রেওয়াজ ছিল না।

মিসেস্ ফালমন্ মারা যাওয়ার পরে নীলগঞ্জের কুঠীর রাঙা 'প্যাটেন' ফুলের গাছ, নদীর ধারের অত বড় বাড়ি, লেবু ও আমের বাগান, পসার প্রতিপত্তি, অর্থসম্পত্তি সব কিছু শ্রীহীন হইয়া পড়িল। বাড়ির এক নিম্নজাতীয়া দাসীর সঙ্গে সাহেবের নাম জড়িত হইয়া চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল। মার্জারি ও ডোরা বিবাহ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সাহেবের যে ছেলে বিলাতে পড়িত, সে আর এদেশে আসিলই না। শোনা গেল, ইংলণ্ডেই বিবাহ করিয়া সেখানেই সংসার পাতাইয়া সে ইংলণ্ডের প্রজাবৃদ্ধির দিকে মন দিয়াছে।

এই সময় নীলগঞ্জের কুঠীতে এক ঘটনা ঘটিল।

বাহির হইতে কে একজন সাহেব আসিয়া কিছুদিন কুঠীতে রহিল। এ সময়ে প্যাটও কুঠী হইতে চলিয়া গিয়াছিল। নবাগত সাহেবের নাম মিঃ মুডি। এ অঞ্চলে তাহাকে "মুদি সাহেব" বলিত সবাই। মুদি সাহেব একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাইত।

একদিন কি ঘটিয়াছিল কেহ জানে না, গভীর রাত্রে মিঃ ফাল্‌মনের সঙ্গে মুদি সাহেবের বচসার শব্দ শোনা গেল। বাহির হইতে চাকরে বাকরে কিছু বুঝিল না। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল, সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে মুদি সাহেবের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ

ঘরের মেঝেতে লুটাইতেছে এবং ঘরের কোণে সেই নীচ জাতীয়া দাসীটা দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

পুলিশ তদন্ত হইল। মিঃ ফাল্‌মনের কিছু হয় নাই, ব্যাপার নীলকুঠীর শক্ত কম্পাউণ্ডের বাহিরে এক পাও গড়ায় নাই।

এই ঘটনার পরেও ফালমন্ সাহেব অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। একাই থাকিতেন। পুত্র কন্যা কখনো আসিতও না। সাহেবের এক ভাই শোনা যায় ইংলণ্ড হইতে কতবার তাহাকে সেখানে যাইতে লিখিয়াছিল, ফালমন্ সাহেব বলিতেন—এদেশেই জন্ম, এদেশ ভালবাসি। যাবো কোথায়? যখন মরে যাবো ওই নিমতলাডায় কবর দিও, বাবা আর মায়ের পাশে। এদেশেই জন্ম, এদেশেই মাটি মুড়ি দেবো।

ফালমন্ সাহেব এদেশেই মাটি মুড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে। নীলগঞ্জের কুঠী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। এখন সেখানে দিনমানেও বাঘ বুনো শূয়োরের ভয়ে কেউ যায় না। কুঠীর নিমতলায় ঘন বুঁচকাঁটায় দুর্ভেদ্য ঝোপের ছায়ায় খুঁজিলে ফালমন্ সাহেবের কবরের ভগ্নাবশেষ এখনো কৌতূহলী রাখাল বালকদের চোখে পড়ে। আলমপুর পরগণার বড় তরফের দে চৌধুরী জমিদার বাবুরা নীলগঞ্জের জমিদারি গবর্ণমেন্টের নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন।

বরো বাগদিনী

ওর নাম 'বরো', এর মানে বলতে পারব না। সবাই ডাকে বরো বাগদিনী ব'লে। একটু মোটাসোটা, কুচকুচে কালো, আঁট খাঁট গড়নের, বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।

এই পাড়াতেই বামুনবাড়ি বরো কাজ করতো, বাইরের কাজ, কারণ বাগদিনীর হাতের জলে কোন কাজ হবে না। গোয়াল গোবর করা অর্থাৎ গোয়াল পরিষ্কার করাই ছিল তার প্রধান কাজ। বিচুলি কেটে গরুকে জাবও দিত। উঠোন ঝাঁটও দিত।

একদিন শুনলাম, বরো মুখুয্যেবাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছে। মুখুয্যে মশায় নিজেই এসে আমার কাছে নালিশ করলেন। বললেন —তুমি তো পল্লীমঙ্গলের সেক্রেটারী, এর একটা বিহিত করো—

—কি ব্যাপার হয়েচে কাকা?

—সেই বরো বিটি আজ কোথাও কিছু না, কাজে এল না আমার বাড়িতে। এক হাঁটু হ'য়ে রয়েছে গোয়াল, থৈ থৈ করচে উঠোন আর বিটি কিনা স্বচ্ছন্দে বললে আমি কাজ করবো না। ছোটলোকের এত বড় আস্পদ্দা আর সহ্যি হয় না। বলি যাই দিকি বিভূতির কাছে, একটা বিহিত এর করো দিকি বাবা।

—কাজ ছাড়লো কেন হঠাৎ, তা কিছু জানেন!

—কি করে জানবো বাবা, কাল বললে আমার তামাক পোড়া খাওয়ার পয়সা আলাদা দিতে হবে। তাই বললাম, তিন টাকা করে মাইনে আবার তার ওপর তামাক পোড়া খাওয়ার পয়সা! পারবো না। তাই বাবা—

—এর কি করা যাবে পল্লীমঙ্গল থেকে বলুন? আপনার পয়সা-

কড়ি নিয়ে সে তো আর চলে যায়নি। আমি কি করবো বলুন কাকা। আমার দ্বারা কিছু হবে না।

—তা হবে কেন? তা কি আর হবে? ছাই ভস্মো কি সব মাথামুণ্ডু লিখতেই শিখেচো। গাঁয়ের কোন উপ্‌গার কি তোমায় দিয়ে হবে বাবা—তা হবে না। সে বুঝতে পেরেচি অনেকদিন—

মুখুয্যে কাকা অপ্রসন্ন মুখে চলে গেলেন। কি করবো—আমি নাচার। পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী তো আর নবাব নাজিম খান্‌জাখাঁ নয় যে, যাকে তাকে ধরে নিয়ে এসে যে কোনো অপরাধে গর্দান নেবো। আমি কি করতে পারি বরো বাগদিনীর?

হঠাৎ বরোর সঙ্গে একদিন গোপাল নগরের পথে দেখা।

একটা ভাঙ্গা চুপড়ি কাঁখে সে বাজারে যাচ্চে, পরনে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র।

বললাম—কি বরো? ভাল আছ?

বরো থমকে রাস্তার এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল জড়সড় হ'য়ে, আমার পথ দেবার জন্য, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, পথ দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট চওড়া। বললে—বাবু, আমাকে কাঠ দেবেন একখানা!

—কাঠ? কি কাঠ?

—বাবু, সেই রেশম কাঠ।

—বুঝলাম, তোমার নেই?

—না বাবু, কে এনে দেবে, মোদের কথা কি কেউ শোনে? কাপড় নেই। এই দেখুন এই কাপড়খানা—

বরো আঁচলের অংশটুকু আমার সামনে মেলে ধরলে। বললাম —থাক্ থাক্ ও দেখাতে হবে না, দেখেই বুঝতে পাচ্চি।

কথাটা তখনি মনে পড়ে গেল।

বললাম—আচ্ছা, মুখুয্যেবাড়ির কাজটা ছেড়ে দিলে কেন হঠাৎ? মুখুয্যে কাকা সেদিন বলছিলেন—

বরো আমার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে বললে—সে বাবু আর আপনার সামনে বলবো না।

একটু এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে বললে—ওনার মতিগতি ভাল না বাবু, এই একটা কথা আপনাকে বললাম—

বরো চলে গেল।

ব্যাপার কি ?

মুখুয্যে কাকা কি বরো বাগদিনীর কাছে প্রেম করতে গিয়েছিলেন ? উভয়ের এই বয়সে ? বিশ্বাস তো হয় না। করুকগে, পরের কথায় দরকার কি আমার !

পৌষমাসের প্রথমেই ভীষণ শীত পড়লো।

একদিন রাত দশটাব পর ওপাড়ার হাজারি ঘোষের বাড়ি থেকে ভাগবতের কথকতা শুনে ফিবচি এমন সময় পায়ে-চলা মাটির পথের ধারে একখানা কুঁড়ে ঘবেব দাওয়ায় কে শুয়ে আছে দেখে সেখানে থমকে দাঁড়ালাম।

এ পাড়ায় আমার যাতায়াত খুবই কম। তার ওপর বহুকাল গ্রামে না থাকাব দরুণ কোন্‌টা কার বাড়ি চিনিনে। এগিয়ে গিয়ে বললাম—শুয়ে কে ?

—কে, বাবু ? আসুন। কনে গিয়েলেন এত রাত্তিরি ? আমি বরো।

—ও, এই তোমার বাড়ি নাকি ?

—হ্যাঁ বাবু। এরে কি আর বাড়ি বলে। ওই কোনো রকমে আছি মাথা গুঁজে। গরীব নোকের আবার বাড়ি আর ঘর। আপনিও যেমন।

সত্যি অবাক হ'য়ে গেলাম। কেউ বললে বিশ্বাস করবে না। ছোট্ট একখানা চার চালা ঘর, ঘরের পেছন দিকে দেওয়াল নেই, কঞ্চির বেড়া বা চাঁচ কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা। সামনের যে দাওয়ায় বরো বাগদিনী এতক্ষণ শুয়েছিল তার দুদিকে নোনার পাতার

বেড়া কিন্তু সামনের দিকে একদম ফাঁকা। এই ভীষণ শীতে এই খোলা দাওয়ায় বরো কি একখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের মধ্যেও যেন কে শুয়ে আছে মেঝেতে। বললাম—ঘরে ও কে ?

—ও মোর ছেলে ট্যানো। ওরে চেনেন না ?

—না, তোমার ছেলে আছে তাই জানিনে। কত বড় ?

—তা বাবু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে বড় সড় হয়েছে। কত তা কি মোরা জানি ? এই পাড়ার রাখাল। সবারই গরু চরায়।

—বেশ।

এইবার আমার নজর পড়লো বরো যেখানা গায়ে দিয়েছিল সেই কাপড়খানার দিকে। থলের চট বলেই মনে হওয়াতে জিগ্যেস করলাম—গায়ে দিয়েছ কি ওটা ?

—এখানা বাবু কম্বল।

—কি রকম কম্বল ?

—আর বছর বনগাঁ থেকে এনে ডাক্তার বাবু বিলি করেলেন। এর মধ্যে তুলো পোরা। পাঁচখানা মোদের গাঁয়ে বিলি হয়েল, গোরমেণ্ট থেকে নাকি বিলি হয়েল। কি জানি বাবু, আপনারাই জানেন—মোরা কি খবর রাখি বলুন। দিলে একখানা, নেলাম। তা বাবু কাপড় একখানা পাবো না ? মুছলবে বেরোবার উপায় নেই—

গ্রামের লোকে কি করে জীবন কাটায়, ভাল করে দেখিনি কোনোদিন, আজ একে দেখে তা বুঝলাম। এই শীতে একখানা থলের চট গায়ে দিয়ে বাইরে শুয়ে যে আছে, তার কালই নিমোনিয়া যদি হয় এবছরের এই ভীষণ শীতে, তবে কোন্ ডাক্তারখানা থেকে এদেব ওষুধ আসবে ?

দিনকতক পরে গ্রামে বাঘের উপদ্রব হোল। প্রতি বৎসরই শীতকালে বাঘের উপদ্রব হয় এ অঞ্চলে। লোকের গোয়াল থেকে গরু বাছুর নেয়, রাত্রিচরা গরু তার পরের দিনের আলো হয়তো আর

দেখে না। এ বছর উপদ্রবটার বাড়াবাড়ি দেখা গেল। দিনদুপুরে দক্ষিণ মাঠের বেগুনের ক্ষেতে কি নয়ালি দীঘির পাড়ের জঙ্গলে কি চুয়োডাঙ্গার রাস্তার অশ্বত্থ গাছের তলায় বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখে চাষী কি পথ-চলতি লোকে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে ইচ্ছামতীর ধারের বাঁশবনের পথ দিয়ে সীতে জেলে মাছ ধরে নিয়ে তেঁতুলতলার ঘাট থেকে বাড়ি ফিরচে, মস্ত বড় বাঘ (অবিশ্যি সীতে জেলের বর্ণনানুসারে) রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে। জনপ্রাণী নেই তেঁতুলতলার ঘাটের পথে, বাঘও নড়ে না—সীতে জেলের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—তারপর বাঘটা হঠাৎ লাফ দিয়ে পাশের ঝোপে কেন পালিয়ে গেল সেই জানে। একদিন তো আমারই বাড়ির পেছনে বাঁশবনে সন্ধ্যা রাতে ফেউ ডাকতে সুরু করলো। হাট থেকে ফিরবার পথে বরো বাগদিনীর ঘরের পাশ দিয়ে এলাম ওকে বাঘের কথাটা বলে সতর্ক করে দেবার জন্যে।

জ্যোৎস্না উঠেছে, সন্ধ্যার অল্প পরেই। তেমনি শীত।

বরো দেখি দাওয়ায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে একটু করে ঘুঁটের আগুন। একেবারে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

—কি বরো, এত সকালে শুয়ে পড়েচ ?

—বাবু ? আসুন, বড্ড জ্বর এয়েল দুপুর বেলা। আজ আর হাটে যেতে পারিনি। চটখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি।

—তোমাকে এলাম একবার সাবধান করে দিতে। বাইরে এরকম শোয়া ঠিক না। কাল তো আমার বাড়ির পেছনের বাগানে বাঘ ডেকেছে। তোমার ঘর আরও বনের মধ্যে—

—বাবু, কিছু হবে না। বাঘে মোদের কি করবে ? ও ভয় নেই মোদের। তা থাকলি কি আর বারোমাস এই ফাঁকা জায়গায় শুতে পারি ? ও মোদের সয়ে গিয়েচে। ভয় ডর থাকলি কি মোদের চলে ?

একদিন পরের কথা।

সকালবেলা হৈ হৈ ব্যাপার। সবাই ছুটচে ওপাড়ার দিকে।

বরো বাগদিনীকে নাকি শেষরাতে বাঘে মেরেচে। সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না।

ব্যাপার কি দেখবার জন্য ছুটলাম ওপাড়ার দিকে।

গিয়ে দেখি বরো বাগদিনীর ঘরের উঠানে লোকে লোকারণ্য। বরো বাগদিনীর গলা সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে। সে হাত পা নেড়ে কি একটা বর্ণনা করচে সকলের সামনে। আর সেই জনমণ্ডলীর মাঝখানে বরো বাগদিনীর দাওয়ার ঠিক সামনের উঠানে একটা বড় গুল-বাঘ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বরো বাগদিনী নাকি বাঘটাকে গত শেষরাত্রে কাস্তে বঁটি দিয়ে মেরেচে।

জিগ্যেস করলাম—কাস্তে বঁটি দিয়ে অত বড় বাঘটাকে—?

তখন বরো আবার আমার দিকে ফিরে তার কাহিনী গোড়া থেকে স্বরু করলে। সত্যিই সে বাঘটা মেরেচে এবং বঁটি দিয়েই মেরেচে। শেষরাত্রে বাঘটা ওর ঘরের পেছনে এসে হাঁক পাড়ে। বরোর ছেলে ঘর থেকে ভয়ে চীৎকার করে উঠতেই বরোর ঘুম ভেঙে যায়। ছেলেকে বাঘে ধরেচে ভেবে ও দাওয়ার কোণ থেকে কাস্তে বঁটি নিয়ে বাঘের ঘাড়ে পড়ে। বাঘ আসলে তখন ধরেচে ওদের সেই ধাড়ি ছাগলটাকে। অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছে না বাঘে ছাগল ধরেচে না ছেলে ধরেচে। কাস্তে বঁটি দিয়ে বাঘের ঘাড়ে মরীয়া হয়ে নির্ঘাত ঘা কতক কোপ দিতে বাঘ সেখানেই ঘাড় কাত করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়—এই হোল বরো বাগদিনীর বর্ণনা।

ভিড়ের মধ্যে মুখুয্যে কাকা ছিলেন, তিনি বললেন—তোর একটুও ভয় করলো না ওর সামনে যেতে? বরো বললে—মোর কি তখন জ্ঞান ছিল, দাদাঠাকুর? মোর আজ দুদিন জ্বর। ওই উনি (আমার দিকে আঙুল দিয়ে) পরশু দেখে গিয়েলেন। বাঘ হ্যাঁকোর হ্যাঁকোর করে উঠলো তাও শোনলাম জ্বরের ঘোরে, মোর ছেলে চীৎকার করে উঠলো, তাও শোনলাম। জ্বরের ঘোরে ভাবলাম মোর

ছেলেটাকে বাঘে ধরেচে—তখুনি কাস্তে বঁটি কোণ থেকে তুলে নিয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িছি—মোর তখন জ্ঞানগম্যি নাই—ছেলেকে বাঘে খাবে আর মুই বসে ছাখবো? মোর পেরাণ যায় আর থাকে—বাঘ আসলে মোর ঐ ধাড়ি ছাগলডা ধরেচে তখন—মুই কি অন্ধকারে চকি দেখতি পাচ্ছি কিছু? মুই ভাবলাম মোর খোকারে ধরেচে—

ক্রমে ভিড় আরও বাড়তে লাগলো দেখে আসবার উপক্রম করচি এমন সময় বোরো বললে—বাবু, একটা কথা। মোর কাপড় একেবারে ফালা ফালা হয়ে গিয়েচে বাঘের সঙ্গে হুড়যুদ্ধ করতি। এ পরে আছি কলু বাড়ির মনো দিদির থানখানা। সকালে এট্টু চেয়ে এনেচে মোর ছেলে গিয়ে। মোর সে কাপড় তো নক্ত-মাখা নোনাতলায় পড়ে রয়েচে ওই দেখুন—ও আর পরা যাবে না। তা বাবু, রেশম কাট খানা মোরে দিয়ে একখানা কাপড়ের ব্যবস্থা করে ছান আপনি—এ পরের কাপড়, ওরা আজই চেয়ে নিয়ে যাবে এখন—মুছলবে বেরুতি পারবো না বস্তর বিনে—

মুখুয্যে কাকাও আমার দিকে চেয়ে অনুনয়ের স্বরে বললেন—দাও বাবাজি, ওর রেশন কার্ডখানা দেওয়ার ব্যবস্থা করো, আর যাতে একখানা কাপড় ওকে আজই দিতে পারো—ওর মোটেই কাপড় নেই—যাতে হয় বাবাজি—তুমি মনে করলেই হবে—

মুখুয্যে কাকা আমার হাতদুটো ধরেন আর কি!

প্রভাতী

সেদিন কি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হোল নদীর তীরের কানন-ভূমিতে।

জানি, এসব কথা লেখা এত কঠিন! একটা ছত্র যদি লিখতে ভুল হয়, মনের ক্রমের সঙ্গে না মেলে, তবে সবটাই ভুল হয়ে যাবে, অস্পষ্ট হবে, অবাস্তব ঠেকবে।

তবু আমায় চেষ্টা করতে হবে। সে অভিজ্ঞতার আনন্দ পরকে দিতে হবে। নিজে ভোগ করে চুপ করে বসে থাকা আমার ভালো লাগে না।

বর্ষার দিনের মেঘমেদুর আকাশ। ঠাণ্ডা দুপুরটি, অথচ বৃষ্টি হয়নি আজ তিন চারদিন। রাস্তা ঘাট শুক্‌নো খট্‌ খট্‌ করচে। ঘন মেঘ জমে রয়েচে আকাশে, কালো মেঘে অন্ধকার জল-স্থল, বৃষ্টি এল এল, অথচ বৃষ্টি আসচে না। স্নান করতে গেলাম নদীতে, ঘরের বাইরে পা দিয়েই কি যে আনন্দ হোল মনে!

সবুজ তাজা প্রাণের প্রাচুর্যে ধরিত্রীর অঙ্ক ভরপুর। শ্যামল আভা, সবুজ মটরলতা, মটরলতায় মটরফল, মাকাল-লতার অগ্রভাগে মাকাল ফল, বুনো যজ্ঞিডুমুর গাছের আর্দ্র গুঁড়িতে থোলো থোলো কচি ডুমুর, ঝোপে ঝোপে নাকজোয়ালের সুদৃশ্য তিন রঙা ফুল (gladiosa superba) দুলচে সজল বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে দুলচে বাঁশের কোঁড়, নদীর গৈরিক জল, ওপারের কাল নলখাগড়ার গুচ্ছ। আমি নদীজলে অবগাহন করলাম বাঁশতলার ঘাটে। স্নান করে উঠলাম সিক্ত বস্ত্রে। উঁচু পাড়, চখা বালির ঘাট, পায়ে এতটুকু কাদা লাগে না কোথাও, আবক্ষ অবগাহন করো, যতদূর যাও ততদূর চখা বালি। নম্র, নতশীর্ষ বেণুবন ঘাটের জলে ছায়া করে থাকে খর রোদের

সময়, খড়খড় শব্দ করচে তালগাছে দোদুল্যমান বাবুই পাখীর বাসা। উঁচু পাড় বেয়ে উঠতে ডানধারে এক বিরাট ঝোপ, তার মাথায় মাথায় মটরলতার ঝোপ, আঙুরলতার ঝোপ। কাবুলী আঙুর নয় অবিশ্যি, আমাদের বনে এক রকম অতি সুদৃশ্য লতা বর্ষায় গাছের মাথা বেয়ে গজিয়ে উঠে নিবিড় ঝোপের সৃষ্টি করে, আঙুরের মত খাঁজকাটা পাতা, আঙুরের মত থোকো থোকো ফল ধরে লতার গাঁটে গাঁটে। মটরলতাও যাকে বলচি, মটরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই—ওকে বলে বড় গোয়ালে লতা, মটরের মত ছোট ছোট চমৎকার ফল গুচ্ছ গুচ্ছ দুলচে লতাগ্রভাগে, সবুজ কচি পত্রসম্ভার বুনো যজ্ঞিডুমুর গাছের তলায় নিবিড়তার সৃষ্টি করেচে।

আমি ভালবাসি এ ধরনের সম্পূর্ণ বন্য গাছঝোপ দেখতে, নইলে বিহারে চাকুলিয়া মিলিটারী ক্যাম্পের লোহার বেড়ায় দেখেচি পটপটি-লতার ফুল—সে আমার ভাল লাগেনি, কেননা তার পাশেই রয়েচে ট্যাঙ্ক, মোটর, ট্র্যাক্টর প্রভৃতি জিনিস—যার পাশেই অদূরে রয়েছে বম্বার প্লেনের সারি। এখানে সে সবের বালাই নেই। নিভৃত লতাবিতান ও কাননভূমি ও পল্লীনদীর শান্ত তীর, মানুষের উগ্রলোভ ও অর্থোপার্জনের জন্য নিষ্ঠুর স্বৈরাচার এর জন্যে পটভূমিকা রচনা করেনি।

তারপর যে কথা বলছিলাম।

স্নান করে ঝোপটির কাছে এসে দাঁড়ালাম।

বেশ চমৎকার লাগছিল।

হঠাৎ নিজের মন সংযত করে নানাদিক থেকে মনকে কুড়িয়ে এনে চুপ করে দাঁড়ালাম। ঠিক যেন দেবদর্শনে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা জগৎ যেন দেখতে পেলাম ঝোপের মধ্যে উঁকি দিয়ে। এতক্ষণ কোথায় কি পাখি ডাকছিল সেদিকে মন দিইনি। এই সময় ঝোপের গভীর অন্তঃপ্রদেশ থেকে একটা পাখী শুনলাম থেকে থেকে ডাকচে—অনেকক্ষণ থেকেই ডাকচে, বহুদূর থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসচে

মেঘশীতল আকাশের তলা বেয়ে। মন সমস্তটা কুড়িয়ে এনে যেমন এই ঝোপের দিকে দিয়ে একমনে দাঁড়ালাম, অমনি এই সব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। অমনি ঝোপের মধ্যে উঁকি মেরে সেই অদ্ভুত, অপূর্ব জগৎটাকে দেখতে পেলাম।

যে জগৎ কি আমি বর্ণনা করতে পারি ?

এত সূক্ষ্ম, এত অদ্ভুত ধরনের জগৎ এ !

যে জগতে শুধু বনকলসীর গায়ে বেগুনি ফুল ফোটে, টুকটুকে মাকাল-ফল দোলে, মটর ফলের লতায় টুনটুনি পাখী বসে গান করে, বর্ষার সজল প্রভাতে যজ্ঞিডুমুরের পাকা ফল টুপ টুপ করে মাটিতে পড়ে, বনকুসুমের গন্ধ ভেসে আসে—বহুদূরের জগৎ অথচ খুব নিকটের—কিন্তু সে নিভৃত, নিবালা জগৎ অতি নিকটে থাকলেও চেনা যায় না, দেখা যায় না, দৃষ্টির অতীত, স্পর্শের অতীত কোন অনুভূতির রাজ্যে তার অবস্থান ধরা দেয় না কিছুতেই। কি অবর্ণনীয়, গাঢ় শান্তি ও অপরূপ সৌন্দর্য বহন করে আনে দূর-থেকে দেখা তার মনোমোহিনী রূপ। তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না, কতকগুলি প্রতীক দিয়ে তাকে একটুকু বোঝানো যায় কি না যায়! অন্তর্মুখী মন সে জগৎকে একটু স্পর্শ করে যায় মাত্র—সে জগৎকে দেখতে পেলে মনের উদ্বোধনের নব-দ্বারপথে উঁকি দিতে হয়, তবে যদি ধরা পড়ে! আরও কত কি রহস্যময় কথা শোনায় এ জগতের পত্রমর্মরে। মন কোথায় নিয়ে যায় সীমাহারা সৌন্দর্যের রাজ্যে, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রত্ব ও বন্ধন থেকে মুক্তিব সন্ধান যোগায়—যে-মুক্তি নিরাসক্তির অমরত্বে ঐশ্বর্যশালী, প্রতিদিনের পরিচিত জগতের বহু দূরে যে লোকাতীত লোকের বাণী মাঝে মাঝে দু'একজন মানুষের কানে এসে পৌঁছায়।

কতক্ষণ অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তখনও সেই নিভৃত, গুপ্ত জগৎ আমার চোখের সামনে ঝলমল করচে মৌন আমন্ত্রণের মুখরতায়। কিন্তু স্কুলের বেলা হয়ে গেল, দাঁড়ানোর উপায় নেই আমার। মনটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে

চলে আসতে বাধ্য হলাম সে জগতের দূরাগত বংশীধ্বনির মূর্ছনা থেকে।

সেদিনই আবার বাঁশতলার ঘাটে অবগাহন করতে নামলুম সন্ধ্যার আগে। বর্ষার অপরূপ মেঘমেদুর অপরাহ্ণ, পাখী তেমনই ডাকচে, বনকলমীর ফুল তেমনি ফুটে আছে, মটর-লতা তেমনি দুলচে—কিন্তু লতাবিতানের নিরালা ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ও-বেলার দেখা সে রহস্যময় জগৎ অন্তর্হিত হয়েচে। কিছুতেই তাকে আর খুঁজে পেলাম না।

সাহায্য

গরীবপুরের হাট হপ্তায় দুদিন। দুদিনই আসি।

গোপালনগরের বাজারে পানবিড়ি বিস্কুটের দোকান। রোজ দোকানে যা বিক্রি, হাটে এলে অনেক বেশি বিক্রি হয় তার চেয়ে; আশে পাশের ক'খানা গ্রামের হাটই করতে হয় এজন্যে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমাদের গাঁয়ের গোপীনাথ বৈরাগী আছে আর গোপালনগরের আলি নিকিরি, মধু জেলে। কিন্তু ওরা গোপালনগর ইষ্টিশান পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে, বাকিটা যেতে হবে আমাকে একলা। নিতান্ত ভীতু নই, তাই ওই বন-বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারবো। আমি পানবিড়ি বিস্কুট বড় থলের মধ্যে পুরে বললাম—চলো। সন্দে হয়ে গেল যে—শীতও পড়েচে আজ বড্ড—

আলি নিকিরি বললে—রও গো রও। তবিল বেঁধে নিই—শীত পড়েচে বটে—

তারপর আমরা তিনজনে রেল রাস্তায় উঠলাম। রেল লাইনের পাশে সরু পায়ে চলার পথ। কিন্তু আমরা সবাই যাচ্ছি একখানা স্লিপার থেকে আর একখানা স্লিপারে পা দিয়ে ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে। গরীবপুর ইষ্টিশান ছাড়িয়ে লাইনের দুধারে মাঠ আর বন। নির্জন জায়গা, লোকজনের বসতি নেই। ছ'মাইল দূরে গোপালনগর ইষ্টিশান। এ ছ' মাইলের মধ্যে লাইনের বাঁ পাশে কেবল একখানা চাষাগাঁ আছে মেহেরপুর, তার আধ মাইল পরেই গোপালনগর ইষ্টিশান।

সুতরাং অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে হেঁটে এই অন্ধকারে। বেশ মজা লাগে তিনজনে গল্প করতে করতে যাচ্ছি বলে।

আলি বললে—কত বিক্রি হোল গো ?

—সাত টাকা পাঁচ আনা।

—পানবিড়ি ?

—বিস্কুটও আছে।

—আছে দু' একখানা ? বড্ড খিদে পেয়েল। খ্যাতাম।

—না আলি দা। গুঁড়োগাঁড়া পড়ে আছে টিনি। সে আর তোমারে দেবো না।

গোপীনাথ বৈরাগী ঘুনসি চিরুনি কাঠের মালা বিক্রি করে। সে বললে—হাট আর সে যুতের নেই বামুন দা। এই গরীবপুরের হাটে আগে আগে পাঁচ টাকার কম হাট থেকে ফিরতাম না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়েচে দুই তিন—আজ ন' সিকে। এতে মুনফা কি পাই আর পেট চালাই কি দিয়ে। সাড়ে তিন টাকা সরষে তেলের সের। পয়সা লোট্‌চে আলি ভাই—

আলি বললে—কি আর লোট্‌লাম ? মনসুর বনগাঁর বাজারে বসে, একডালা খয়রা আর একডালা পুবে চিংড়ি—রোজ সতেরো টাকা আঠারো টাকা মুনফা—আমার সেই জায়গায় সাত আট—বড্ড জোর নয়।

—উঃ রে মুনফা !

—বড্ড হোল ?

—আমরা তো ধারণা কত্তি পারিনে—

—পারবা কি করে। ঘুনসি কাঠের মালা ক'জন লোকে কেনবে ? ও না হলিও লোকের চলে যাবে। কিন্তু মাছ না খেলি মুখে ভাত ওঠবে কি দিয়ে সেটা বোঝো। এই শীতি মাছ না খেলে মানুষ বাঁচে ?

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম—চুপ চুপ ওই শোনো—

সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে চারিপাশে। সামনে একটা রেলের ছোট সাঁকো। তার দুদিকে জলাভূমি, জলার ধারে জঙ্গল বেজায় ঘন। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটু দূরে ফেউ

ডাকচে। ক'দিন ধরে আমাদের এ অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব হয়েচে। প্রায়ই এ গ্রাম ও গ্রামে গরু ছাগল ধরে নিয়ে যায়। সামনে পড়লে মানুষকে কি আর ছাড়ে?

আলি সভয়ে বলল—কোথায়?

—রেলের পুলের ধারে জঙ্গলে—

—দাঁড়াও সব।

গোপেশ্বর এগিয়ে এসে বললে—চলো চলো, ও কিছু নয়—এতগুলো লোককে বাঘ ধরচে না—চলো—

বাঘের জলা পার হয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। মধু জেলে ছেলেমানুষ, তার ভয় হয়েচে। সে বললে—রায় কাকা বাবু, মোরে মাঝখানে করে ন্যাও—

আমি ধমক দিয়ে বললাম—নে, আচ্‌কান! বিশ বছরের ধাড়ির ভয় দ্যাখো—শীতকালে ফি বছর বাঘ আসে, জানো না?

মধু বললে—না, পায়ে পড়ি মোরে এট্টু মাঝখানে ন্যান্—মোর গা ডোল দিয়ে উঠেচে—এই দেখুন হয় না হয়—

—এত ভয় তোর? হাট কত্তি আসিস কেন? মার আঁচল ধোরে বসে থাক গে।

কথাটা বললে আলি নিকিরি।

মধুকে মাঝেই নেওয়া হোলো সবার কথায়।

মধুর ভয় তখনো যায়নি। বললে—রাত্তিরি ছ'টা পয়সা বাঁচাবার জন্যি এল গাড়িতি না গিয়ে হেঁটে এ্যালেন সবাই কিন্তু ভাল কাজ করলেন না। আজ মঙ্গলবার অমাবস্যে—সেবার মুই আলেয়া ভূত দেখেলাম চাতরাবাগির বিলি—

আলি বললে—বিলির জলে?

—না গো। বিলির জলের ধারে। জ্বলচে নিবচে জ্বলচে নিবচে—

গোপেশ্বর বললে—যাকগে। রাত্তির কালে ওই সব—রাম, রাম, রাম, রাম—

আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে রেখেচি। এ দলের মধ্যে সাহসী আলি নিকিরি, তার পরেই আমি; ভূতটুতের ধার ধারিনে। মধু ছেলেমানুষ, ওর না হয় ভয় হওয়া সম্ভব—কিন্তু গোপেশ্বর বোষ্টম আধ-বুড়ো লোক, ওরও ভয়! হাসি পায় বৈকি।

এর পরে নানারকম ভূতের গল্প উঠলো। জলার মধ্যে নক্ষত্র জ্বলচে, কাশবনে, খড়বনে শেয়াল ডাকচে। শ্যাম-লতার সাদা ফুল অন্ধকারে দেখা যাচ্চে ঝোপে ঝোপে, মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্চে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে পায়ের তলায় ঘাসবনে।

আলি নিকিরি মাছের ব্যবসার গল্প করচে। এবার ও পাঁচ-পোতার বিল জমা নেবে, আশিখানা কোমড় আছে। এক এক কোমড়ে দু মণ মাছ হবে। গোপেশ্বর জিগ্যেস করলে—কোমড় যে পেতেছিল, সে মাছ তোলেনি তা থেকে?

আলি বললে—কি করে ধরতি পারবে? অত জলে আর কচুরি-পানার দামে বোঝাই বিলির মধ্যি মাছ! অত সোজা না মাছ ধরা!

গোপালনগর ইষ্টিশান এল, ওরা রেলের বেড়া টপকে অন্য রাস্তায় চলে গেল। আমি এবার একা। ইষ্টিশান ছাড়িয়ে দুধারে জঙ্গল বড্ড ঘন। আমার ভয় ডর নেই, অত বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একাই যাচ্চি, নানারকম অপদেবতার গল্প শুনেও। রায়পুরের রাস্তাটা যেখানে রেল লাইনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেখানটাতে জঙ্গল বড্ড ঘন।

হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ওটা কি জঙ্গলের মধ্যে সাদা মত! নড়চে! একটা কুস্বরও কানে গেল! সর্বনাশ! এখন উপায়? আমার গলা কাঠ হয়ে গেল। হাত পা যেন জমে হিম বরফ হয়ে গিয়েচে।

কানে গেল কে যেন ক্ষীণ দুর্বল স্বরে কি বলচে। আমার শরীর দিয়ে যেন ঘাম বেরিয়ে গেল। এ তো মানুষের গলা। ভূতে শুনেচি নাকি সুরে কথা কয়।

ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখি একটা কালোমত বুড়ো লোক ময়লা নেকড়া-চোকড়া জড়িয়ে বসে আছে একটা কুঁচঝোপের নিচে। ভয়ের স্বরে লোকটা টি টি করে বললে—মোরে খাতি দাও। না খেয়ে মরে গেলাম।

—এখানে কি করে এলে? বাড়ি কোথায়?

—মোরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েল গোপালনগর ইষ্টিশানে। হাঁটতি হাঁটতি এইটুকু এয়েলাম। না খেয়ে মলাম। এট্টু জল ত্যাও। বাঁচবো না—মোরে বাঁচাও—তুমি মোর ধম্মের বাপ—

—গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলে কেন? টিকিট করোনি?

গায়ে মায়ের দয়া হয়েচে! হাঁটতি পারিনে। সারা অঙ্গে ব্যথা। মোরে বাঁচাও—

অন্ধকারে ভালো দেখতে পাইনে। তাইতো, ওর সারা গায়ে বসন্ত বেরিয়েচে! নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। আর এই শীতে, এই নির্জন রেল রাস্তার ঝোপের মধ্যে···আমার সারা গা শিউরে উঠলো। কিন্তু কি উপায় করি আমি একা?

—বিস্কুট খাবা?

আমার থলেতে বিস্কুট আছে। তখন আলি নিকিরিকে মিথ্যে কথা বলেছি। রোজ রোজ বিনি পয়সায় পরকে বিস্কুট খাওয়াতে গেলে চলে না। ও কি কখনো বিনি পয়সায় মাছ খাওয়ায় আমাকে? থলেতে খান কুড়ি বিস্কুট ছিল, থলে ঝেড়ে ওর নেকড়াতে ফেলে দিলাম দূর থেকে। একটা বিড়ি ও একটা দেশালাইয়ের খোলে দুটি মাত্র কাঠি পুরে ওর নেকড়াতে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম—বিড়ি খাও—

বিড়ি ধরাবার সময় দেশালাইয়ের কাঠি ও অতি কষ্টে জ্বাললে। ওর হাত কাঁপচে। দেশালাইয়ের কাঠির আগুনে দেখলাম ওর মুখখানা কী বীভৎস দেখাচ্চে বসন্তের ঘায়ে! বলতে নেই, মা শীতলা, রক্ষে করুন।

—এট্টু জল ত্যাও মোরে—জল তেষ্টায় মলাম—

মুস্কিল! জল পাই কোথায়? জলের পাত্রই বা কোথায় এখানে। রাইপুর গ্রাম এখান থেকে আধ ক্রোশ দূর। সেখান থেকে জল আনতে হবে।

যদি না আনি ও তেষ্টায় মরে যাবে। চলে গেলাম সেই অন্ধকারের মধ্যে রাইপুর। কুমোর বাড়ি থেকে একটা কলসী কিনে পাঁচু তরফদারের টিউব-কল থেকে জল পুরে আবার নিয়ে আসি রেল রাস্তার ধারে। ওর কাছে কলসী এনে দেখি সে ক্ষীণ স্বরে কাতরাচ্চে। জল খাবার জন্যে কিছু আনা হয়নি, ভুল হয়ে গিয়েচে। কলসীটা ওর পাশেই বসিয়ে বললাম—কলসীর কাণায় হাত দিয়ে জল খাও।

থলে থেকে আরও গোটাকতক বিড়ি বার করে একটা দেশালাই সমেত কলসীর পাশে রেখে আমি যখন যেতে উদ্যত হয়েছি, লোকটা বলচে—যাচ্চ নাকি?

—হ্যাঁ।

—কনে যাবা?

—বাড়ি যাবো আর কোথায় যাবো?

—মুই দুটো ভাত খাবো—

আমি রাগ করে বললাম—কোথায় পাবো ভাত? রাত ন'টার গাড়ি চলে গিয়েচে, বাঘের ভয়, আমি বাড়ি যাবো কি করে? এখনো এককোশ পথ। আমি চললাম—

—শোনো, ওগো শোনো— —মোর কাছে বসবা না?

—আমার কাজকর্ম নেই তো, বসি তোমার কাছে এখন! কি ঝকমারি যে আজ আমি করিচি! এর পর থেকে আর কোন্ শালা—

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে বললে—মোর বড্ড শীত নেগেচে—

বিবেচনা করে দেখলাম তা লাগতে পারে। আমারই হাড় কাঁপিয়ে দিচ্চে কনকনে উত্তুরে কলাই-ওড়ানো হাওয়ায়। আগুন করে দিই শুকনো ডালপালা দিয়ে ওর কাছ থেকে একটু দূরে।

এবার চলে যাবো, ওর কোনো কথা এবার শুনবো না। ও কিন্তু আবার গোঙিয়ে গোঙিয়ে বললে—মোর কাছে এট্টু বসবা না?

ওর চোখে অসহায়ের মিনতি।

না, বাড়ি যেতে পারলাম না।

এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই সেই হিম-পড়া কনকনে রাতে বাড়ি ফেরার কথা ভুলেই গেলাম। বসে রইলাম সারা রাত সেই আগুনের কাছে। বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর রাতেই লোকটা মারা গিয়েছিল, তা আমি জানিনে—তখনো আমি আগুনের পাশে ঘুমুচ্চি।

গিরিবালা

দেশের বাড়িতে অনেক দিন ছিলাম না। গ্রামের অন্য সব পাড়ার লোকদের ভালো ভাবে চিনিনে বা জানিনে।

সেবার মাঘমাসের দিন, বাজার থেকে ফিরচি এমন সময় একটি সাদা থান-পরা বিধবা স্ত্রীলোক বিনীত সুরে বললে—একটু দাঁড়ান বাবা—

পরে সে সাষ্টাঙ্গে আমাকে প্রণাম করলে।

এরকম ভাবে প্রণাম পেতে আমি অভ্যস্ত নই। সঙ্কুচিত ভাবে বললাম—এসো মা এসো। কল্যাণ হোক।

—ও বেলা কি বাড়ি থাকবেন ?

—হ্যাঁ, কেন বল তো ?

—আমি একবার যাবো এখন আপনার কাছে।

—বেশ।

মনে ভাবতে ভাবতে এলাম, মেয়েটিকে আমি অনেকদিন আগে যেন কোথায় দেখেছি। তখন ওর এরকম বিধবার বেশ ছিল না। তা ছাড়া এখন ওর বয়েসও হয়েছে।

বিকেলবেলা যখন মেয়েটি আমার বাড়ি এল, তখন ওকে ভালো করে চিনলাম। এ দেখচি সেই গিরিবালা। এর যৌবনবয়সে আমি একে অনেকবার দেখেছি, তখন এর বেশভূষা ছিল অন্যরকম। বাজারে যাবার আসবার পথে একে রূপের ঝলক ছুটিয়ে হেলেদুলে চলতে দেখেছি। তখন এর পরনে ছিল লালপেড়ে শাড়ী, বাহুতে অনন্ত, হাতে বালা, কানে মাকড়ি, গলায় হার, কোমরে রুপোর গোট্। অনেকদিনের কথা, তখন ম্যাট্রিক পাশ করে সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি। কার কাছে যেন শুনেছিলাম ওর নাম গিরিবালা, চরিত্রের

পবিত্রতার জন্যে বিখ্যাত নয়। সেই থেকে ওকে দেখলে পাশ কাটিয়ে বরাবর চলে গিয়েছি।

গিরিবালার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম।

এখন ওর বয়েস হয়েচে, যৌবনে কি রকম ছিল আমার মনে হয় না, তবে এখন ওকে দেখে মনে হয় না কোনোদিন ওর যৌবন ছিল। তবে রংটা এখনো বেশ ফর্সা আছে, চোখদুটি এখনো সুন্দর।

মনে ভাবছিলাম গিরিবালার কি দরকার আমার কাছে। আমি তো কোনোদিন ওর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। আমাকে কি করেই বা ও চিনলে। আমাকে এ গ্রামে অনেকেই চেনে না, কারণ বহুদিন অনুপস্থিতির পরে আবার দেশে ফিরেচি। ছেলেবেলায় যারা আমায় চিনতো, তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বেঁচে নেই। গিরিবালা যদিও সেই সময়ের মানুষ, কিন্তু ও আমাকে জানতো না বা চিনতো না সে সময়।

ওর বসবার জন্যে পিঁড়ি পেতে দিয়ে আমার স্ত্রী চলে গেলেন।

আমি বললাম—তোমার নাম গিরিবালা না?

—হ্যাঁ বাবা।

—তুমি আমাকে চেন?

—আপনাকে এ দেশে কে বা না চেনে?

—সেকথা বলচিনে, তুমি আগে আমাকে দেখেছিলে?

—দেখেছিলাম বাবা। তখন তোমার বাবা-মা আছেন। তুমি ইস্কুলে পড়তে যেতে।

—বেশ। বোসো।

কিছুক্ষণ গিরিবালা বসেই রইল চুপ করে। আমি ভাবচি, কেন গিরিবালা এখানে এসেচে। ভেবে কিছুই পাইনি। একটু অস্বস্তি-বোধ করতে লাগলাম।

গিরিবালা বেশিক্ষণ কিন্তু আমায় অস্বস্তি ভোগ করতে দিলে না। হঠাৎ সে বেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে—বাবা, ব্রহ্ম কি?

তার নম্রভাব ও আগ্রহের সুরে মনে হোল জিজ্ঞাসু শিষ্যা যেন পরমজ্ঞানী গুরুর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শুনতে চাইচে।

আমার হাসি পেল। প্রথমটা কিন্তু চমকে উঠেছিলাম।

তা পরিবেশটি মন্দ নয়। আমার সামনে কালকের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। যুদ্ধের খবর পড়চি। জিনিসপত্রের দাম-দস্তুর ক্রমেই বাড়চে। রাশিয়া হেরে যাচ্চে, হিট্‌লারের দুর্মদ বাহিনী লেনিন-গ্রাডের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। চা খাচ্চি। তামাক ধরাবো একটু পরেই। আর ভাবচি, কাল ডাকঘর থেকে কিছু টাকা না তুললে হাট বাজার হবে না।

এমন সময় সাবেকদিনের কুচরিত্রা স্ত্রীলোক গিরিবালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করচে কি? না, ব্রহ্মের কথা। তাই না হয় বাপু জিগ্যেস কর দেশের খবর, আজকালকার খবর। যেমন গদাই পাড়ুই আমাকে মাছ দিতে এসে জিজ্ঞেস করে—দাদাঠাকুর, যুদ্ধির খবরটা কি?

মনে মনে চটে যাই। সে খবরে তোর কি দরকার? জার্মানি কোথায়, হিট্‌লার কে, জানিস্ এ সব? ইউরোপের ইতিহাস পড়েচিস? তবে যুদ্ধের খবরের তুই বাপু কি বুঝবি?

গদাই পাড়ুই তবু পদে ছিল। যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা করা এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। সে আজকাল সবাই করে থাকে। কিন্তু এ বলে কি? আর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করবার উপযুক্ত গুরুও কি সে খুঁজে খুঁজে বার করেচে!

প্রশ্নটা চাপা দেবার জন্যে বললাম—তুমি আজকাল থাকো কোথায়?

গিরিবালা বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে বললে—বাবা, আজকাল আশ্রম করেচি বাজারের পেছনে। গোয়ালাপাড়ার মুড়োয় যে বটগাছ, ওরই উত্তর গায়ে।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠচে ক্রমশঃ। গিরিবালা আশ্রম

করেচে! এত কথা আমি কি করেই বা জানবো। না জানি ভালো করে ওর পূর্ব ইতিহাস, না জানি ওর বর্তমান জীবনের কোনো খবর।

কথাবার্তা চালু রাখবার জন্যে বললাম—বটে! বেশ, বেশ। একদিন তোমার আশ্রমে যাবো।

গিরিবালা হাতজোড় করে বললে—সে সৌভাগ্যি কি আমার হবে বাবা!

—না না, সে কি কথা। কতদিন আশ্রম করেচ?

—তা বাবা বৃন্দাবন থেকে যে বছর ফিরলাম, সে বছরই। শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবন থেকে ফিরলাম, কার্তিক মাসে আশ্রম পিতিষ্ঠা করলাম।

তাহোলে বৃন্দাবনেও গিয়েচে গিরিবালা। না, আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়। ব্যাপার জটিল হয়ে উঠেচে। বললাম—বৃন্দাবনেও গিয়েছিলে?

—পাপমুখে আর কি কবে বলি?

—আর কোথায় গিয়েচ?

—কোথাও আর যাওয়ার দরকার হয়নি। ওখানেই তিনি আমায় কৃপা করেচেন। আর অনর্থক তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে কি করবো? যা কাজ তা হয়ে গেল। তিনি আমায় দয়া করে সব দিয়েচেন।

তিনি মানে ভগবান? না, এ দেখচি খুবই জটিল ব্যাপার। থৈ পাওয়া যাচ্চে না। গিরিবালা প্রবর্তকের থাকেও নেই, একেবারে কৃপাসিদ্ধ। এর সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় কই!

বললাম—ও।

—আমায় তিনি বললেন, আমাকে তোর পূজা করতে হবে না। তুই যে আমার মা। আমি তোর ছেলে।

—বটে!

আমার চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম হয়েচে। আর না, একে এবার তাড়াতে হবে। আর কোনো কথা চলবে না।

বললাম—আচ্ছা, গিরিবালা, আর একদিন শুনবো এখন—একটু ব্যস্ত আছি আজ।

কিন্তু গিরিবালাকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সে হাতজোড় করে বললে—আমার কথাটা ?

—কি ?

—ব্রহ্ম কি ?

—ওসব কথার আমি জবাব দিতে পারবো না। তুমি ও পাড়ার গোঁসাই ঠাকুরের কাছে যাও বরং—

—না বাবাঠাকুর, আপনি বলুন।

—তুমি ভুল করেচ গিরিবালা, আমি বইয়ের ব্যবসা করে খাই। ব্রহ্ম-ট্রহ্মের খবর রাখিনে—

—আচ্ছা বাবাঠাকুর, আর একদিন আমি আসবো। আজ ফাঁকি দিলেন, কিন্তু সেদিন ফাঁকি দেবেন না যেন।

আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গিরিবালা বিদায় নিল।

আমার স্ত্রী জিগ্যেস করলেন—ও কে গো ?

—ওর নাম গিরিবালা এইটুকু জানি। আর জানি যে ওকে তিনি নাকি কৃপা করেচেন।

—তিনি কে ?

—তিনি আর চিনলে না ? তিনি মানে তিনি। ভগবান, গড্, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম।

—আহা হা, ঢং !

বলে স্ত্রী বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। আমি সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের ফটিক চক্কত্তির কাছে গেলাম। ফটিক চক্কত্তির এখন বয়েস হয়েচে, এক সময় যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির অনুষ্ঠান করার ফলে এখন ভগ্নস্বাস্থ্য, হাঁপানি রোগগ্রস্ত।

বললাম—ফটিক কাকা, গিরিবালাকে চেন ?

—এসো বাবা, বসো। কোন্ গিরিবালা? ও নামের অনেক লোক ছিল। কার কথা বলচো?

—এই যে গিরিবালা আশ্রম করেচে গোয়ালপাড়ায়, পথে ঘাটে বেড়াতে দেখি।

—ওঃ, বুঝলাম। ওকে আর জানিনে?

—ওকে জানতে?

—জানতে মানে? জানতে মানে? হুঁঃ, জানতে। বলে—

—যাক, যাক, সে সব কথা যাক গে। বলি ও কি রকম লোক ছিল?

—তা ভালো লোক ছিল। অনেক স্ফূর্তি করিচি ওর সঙ্গে। ওর চেহারা ভারি সুন্দর ছিল। যেমন নাচতে পারতো তেমনি গাইতে পারতো। একবার নন্দ পাল, যতীন দত্ত আর শশী আচার্যি—তিন জনে দোলের দিন ওর ঘরে সে ফুর্তি কি! ওর মদ খেয়ে সে ঘুরে ঘুরে নাচ কি! কালাপেড়ে সাড়ী পরে ঘুঙুর পায়ে—তারপরে ইদিকে—

—গিরিবালা মদ খেতো?

ফটিক চক্কত্তি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললে—নাঃ, তোমায় দিয়ে বাবাজি কাজ চললো না। গিরিবালা মদ খেতো মানে? গিরিবালা মদ খেতো মানে কি? গিরিবালা মদের পিপের জম্মো দিয়েচে বলো। তুমি বাবাজি এ সবের কি বোঝো। কেন গিরিবালার খবর নিচ্চ, কেন বলো তো? ব্যাপার কি?

—এই জন্যে নিচ্চি যে সে কাল আমার কাছে এসেছিল—

—তোমার কাছে এসেছিল? কেন তোমার কাছে—তার এখন আর—তোমার কাছে বাবাজি, এখন তার বয়েস কত?

—না কাকা, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সে এখন আর সে গিরিবালা নেই, সে এসেছিল আমার কাছে ব্রহ্মের কথা জানতে।

—কার কথা জানতে ?

—ব্রহ্মের কথা।

—সে কে ?

—ব্রহ্ম মানে ভগবান, মানে—

—থাক বুঝেছি, থাক বাবাজি। আবার তোমার সামনে যা-তা বেফাঁস বলে ফেলবো বাবাজি—

—আপনি জানেন না, সে আশ্রম করেচে। তিনি তাকে কৃপা করেচেন। তিনি তাকে মা বলে ডেকেছেন—

ফটিক চক্কত্তি বিস্ময়ের সুরে বললে—তিনি কে ?

—ওই দেখুন আবার আপনাকেও—তিনি মানে যাকগে—ইয়ে। আমি এখন যাই। আপনার মেজাজ এখন ভাল নেই দেখচি।

—ভালো কি করে হবে বাবাজি ? যে কথা তুমি সকালবেলা শোনালে তাতে মেজাজ ভালো রাখবার উপায় কি বলো ? গিরিবালা নাকি আশ্রম করেচে। গিরিবালা নাকি—

আচ্ছা তাহোলে এখন আসি ফটিক কাকা। আমার একটু কাজ আছে। বসুন।

শশী আচার্যির নাম পেলাম ফটিক কাকার মুখে। শশী স্থানীয় কালীমন্দিরের পূজারী, এখন বয়েস হয়েচে। চোখে ভালো দেখতে পান না। তাঁকে গিরিবালার নাম করতে তিনি বললেন—গিরিবালা ডাকসাইটে ইয়ে ছিল। সে সব কথা আর তোমার কাছে বলবো না বাবা। হাঁ জানি, সে আশ্রম করেচে, সন্নিসিনি হয়েচে, ওই যে বলে বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী তাই—

গিরিবালার পূর্ব ইতিহাস ভালো ভাবেই জানা হয়ে গেল।

সুতরাং সে যখন পুনরায় আমার বাড়ি সেদিন এল, তখন আমি বেশ কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়েই ওকে দেখলাম।

বৈকাল বেলা। আমি চা খেয়ে একটু বেড়াতে যাবো ভাবছিলাম।

গিরিবালা বললে—বাবা, একটু পড়ে আমায় শোনাবেন? আমি একখানা বই এনেচি।

—কি বই দেখি?

—আপনার বাড়িতেই বইখানা থাক। মাঝে মাঝে এসে শুনে যাবো। বড় ভালো বই বাবা। তা আমি তো লেখাপড়া জানিনে—

বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখলাম। বইখানা অত্যন্ত পুরনো, নাম "সাধনতত্ত্ব ও জীবমুক্তি"। লেখকের নাম শ্রীমৎ ওঁকারানন্দ সরস্বতী, প্রাপ্তিস্থান সাধন আশ্রম, গ্রাম সারাড়িতলা, জেলা পুরুলিয়া, মানভূম। এসব ধরনের বইয়ের ওপর আমার কোনো কালে শ্রদ্ধা নেই, তবুও গিরিবালার মনস্তুষ্টির জন্যে পাতার পর পাতা অত্যন্ত কঠিন সেকেলে বাংলায় লেখা সেই তত্ত্বকথা আমাকে গড় গড় করে পড়ে যেতে হোল।

গিরিবালা মাঝে মাঝে হয়তো প্রশ্ন করে—হ্যাঁ বাবা, তাহোলে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্কটা কি বলচে?

আমি আবার আগের পাতা থেকে পড়ে যাই। যা বুঝতে পারি ওকে বুঝিয়ে বলি। প্রত্যেক পাতা শেষ হওয়ার পর ভাবি এইবার কি একটা ছুতো করে উঠে পড়া যায়।

ঘণ্টাখানেক এভাবেই কেটে যাওয়ার পরে গ্রামের দু'জন লোক হঠাৎ এসে পড়াতে ধর্মালোচনার আসর ভেঙ্গে গেল। গিরিবালা যাবার সময় বইখানা আমার কাছে রেখে গেল। আবার একদিন যত শীগগির হয় ও আসবে 'সাধন তত্ত্ব' শুনতে। আমার স্ত্রী বললেন—ও তোমার কাছে রোজ রোজ আসে কেন? ও আপদকে রোজ রোজ আসতে দিও না।

—তুমি জানো না। গিরিবালা আগে যেমনই থাক, এখন ওর পরিবর্তন এসেচে বলেই মনে হয়।

—তা হোক গে। ও সব লোক কখনো ভালো হয় না। দরকার কি ওর এখানে আসবার?

এবার কিন্তু গিরিবালা যখন এল, তখন সকলের আগে আমার স্ত্রীকে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে। অনেকক্ষণ ধরে কি সব গল্পগুজব করলে। তারপর বাইরে এসে আমার সামনে বসলো, তাকে 'সাধন তত্ত্ব' পড়ে শোনাতে হোল ঝাড়া ত্থ'ঘণ্টা। ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে চা খেতে গেলে গৃহিণী বললেন—গিরিবালা কি চলে গেল ?

—না। বাইরে বসে আছে, সাধনতত্ত্ব শুনবে।

—যাবার সময় যেন এবেলা এখানে খেয়ে যায়।

—কেন, হঠাৎ তার ওপরে এত প্রসন্ন ?

—জানো না, সে এক গাদা ফুলবড়ি নিয়ে এসেচে। তিনখানা আমসত্ত্ব আর অনেকখানি আমের আচার। আমি বললাম আমি নেবো না। এ তুমি নিয়ে যাও। সে আমার হাতে ধরে জোর করে দিয়ে বললে—এ নিতেই হবে। ব্রাহ্মণের সেবার জন্য এনেচি, ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কি ব'লে ?—ওকে এ বেলা খাইয়ে দিতে হবে।

—বেশ। বলচি আমি।

গিরিবালাকে গিয়ে বলতে সে ভারি খুশি হোল। এক গাল হেসে বললে—মায়ের হাতে রান্না পেসাদ পাবো। এ কি আমার কম ভাগ্যি ? বৃন্দাবনে একবার—

—ভালো কথা, বৃন্দাবনে তোমার কি হয়েছিল সেদিন বলছিলে ?

গিরিবালার মুখে হঠাৎ যেন ভক্তি ও দীনতার ভাব ফুটে উঠলো। হাত জোড় করে বললে—ঠাকুর যদি কৃপা করেন, তবে মরুভূমিতে ফুল ফোটাতে পারেন—

—নিশ্চয়ই।

—আমি তবে বলি শুনুন, আমি কত সামান্য মানুষ আপনি তা জানেন। বৃন্দাবন গিয়ে গুপীনাথের ঘেরা বলে জায়গায় আমাদের গাঁয়ের রসিক পরামাণিকের বাসায় উঠলাম। গঞ্জের রসিক পরামাণিক সেখানে অনেকদিন থেকে কাপড়ের ব্যবসা করচে জানেন তো ?

রসিকের দিদি বড় ভালো লোক। আমার তো বৃন্দাবনে গিয়ে কি রকম হোল, দু'চারদিন মন্দির আর ঠাকুর দেখে দেখে বেড়াই। একদিন একেবারে অজ্ঞান।

—অজ্ঞান ?

—বাবাঠাকুর, একেবারে ভাবের ঘোরে অজ্ঞান !

—বল কি ? ভাব সমাধি ?

—যাই বলেন বাবাঠাকুর। দশ বারো দিন একেবারে দিনরাত জ্ঞান ছিল না আমার। নাওয়া-খাওয়া করতে পারতাম না। না খেয়ে মরতে হোত যদি রসিকের দিদি না থাকতো। কি সেবাটাই করেছিল পনেরো কুড়ি দিন।

—এই যে বললে দশ বারো দিন ?

—দশ বারো দিন তো একেবারে অজ্ঞান। তারপর জ্ঞান হোল বটে, কিন্তু ঘোর কাটে না। উঠতে পারিনে, হাঁটতে পারিনে।

—ফিটের ব্যামো ছিল না তো আগে ?

—না বাবাঠাকুর, শুনুন বলি আশ্চর্যি কাণ্ড। সেই অবস্থায় একদিন রসিকের দিদি সন্দেবেলা সঙ্গে করে কাছে এক ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে গিয়েচে। ফিরে আসচি, পায়ে কিসের একটা ঠোক্কর লেগে হোচট্ খেলাম। একখানা ছোট্ট পাথর, মাটিতে আদ্ধেক পোঁতা। মাটি একটুখানি খুঁড়ে হাতে তুলে দেখি, বাবা, পাথরের গোপাল মূর্তি। বাবা, বলবো কি আমার সারা গা যেন শিউরে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম আমি তো মহাপাপী, আমার ওপর তাঁর এ অহৈতুক কির্‌পা কেন ? আমি তো কিছু করিনি তাঁর জন্যি ?

গিরিবালার চোখ ছলছল করে এল। নাঃ, ফটিক কাকা যাই বলুন, এর সত্যই অনেক পরিবর্তন হয়েচে। 'পরম মোহান্তী' হওয়ার পথে উঠেচে দেখচি গিরিবালা। হরিদাস ঠাকুর আর লক্ষহীরার উপাখ্যান চোখের সামনে পুনরায় অভিনীত হতে চলেচে নাকি ?

ফটিক কাকার কথা আর শুনচিনে।

বললাম—তারপর ?

—তারপর বাবা সেই পাথরের বিগ্রহ আমার কাছে তো এসে ঠেলে উঠল। আঁকড়ে আমায় রইল কি বাবা, কোথাও যেতে চায় না! আমারও বাবা সেই যে বলেচে চৈতন্য চরিতামৃতে—নিজেরে পালক ভাবে, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান—'আমারও' হোল তাই। খাওয়া-নাওয়া চুলোয় গেল। গোপাল আমার কি খাবে, গোপাল আমার কি নেবে, এখনো তাই। সেই গোপাল ঘাড়ে চেপে আছে, আর নামতে চায় না। এখানে আমার আশ্রমে তাকেই তো পিরতিষ্ঠে করে তাকে নিয়েই আছি।

—বল কি ?

—কি বলবো বাবা, পুজো করতে দেয় না। বলে, তুমি যে আমার মা। মা হয়ে ছেলেকে পুজো করতে আছে! হাত চেপে ধরে। স্বপ্ন দিইছিল রাত্তিরি। ওর জন্যি ভাত রাঁধতে হবে। আর কোন দেবদেবী আমি জানিনে বাবা ঠাকুর। গোপালই আমার সব। গোপালই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আর কিছু মানিনে।

গিরিবালা অবাকই করেচে আমাকে। হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারিনে।

ও খেয়ে-দেয়ে সেদিন চলে গেল। আমার স্ত্রী খুব যত্ন করেই খাওয়ালেন ওকে। যাবার সময় ও বার বার বলে গেল—সামনের পুর্ণিমের দিন বাবা আমার আশ্রমে ঠিক যাবেন। দেবেন পায়ের ধুলো! বিকেলেব দিকি যাবেন।

গেলাম ওর আশ্রমে পূর্ণিমার দিন বিকেলে। ওদের গ্রামের গোয়ালপাড়ার পেছনে খামারকালনা বলে সেকালের গ্রাম। সে গ্রাম এখন জনশূন্য। বড় বড় ভিটে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। দিনমানে বাঘ বেরোয় খামারকালনায়, বরাবর শুনে এসেছি। সেই খামারকালনার নির্জন বনের প্রান্তে এক প্রাচীন বটতলায় তিন চারখানা খড়ের ঘর। বটের মোটা সরু ঝুরি নেমে এসেচে

চালা ঘরের মটকায়। সন্ধ্যামালতী ফুল ফুটেচে আশ্রমের আঙিনায়। বনে জঙ্গলে পাখীর দল কিচির মিচির করচে। ঘন বিকেলের ছায়া দেখে মনে হয় রোদ বুঝি এদিকের ত্রিসীমানায় কোনদিন ছিল না।

অনেক মেয়ে-পুরুষ দেখলাম ওর আশ্রমে। উঠোনের মাটিতে বটগাছের ছায়ায় বসে তামাক খাচ্ছে পুরুষেরা, মেয়েরা পটল আর লাল ডাঁটা কুটচে রাশীকৃত। আধমণটাক লাল মোটা আউশ চাল ধুচ্চে ছুজন মেয়েতে। আজ নাকি ওরা সবাই এখানে খাবে। প্রতি পূর্ণিমাতেই নাকি এমন হয়। গিরিবালা আমায় পূর্ণিমার দিন আসতে বলেছিল কেন, এখন বুঝলাম।

সন্ধ্যার আগে খোল বাজিয়ে কীর্তন স্বুরু করলে পুরুষেরা। আরো রবাহুত অনেক পথ-চলতি লোক এসে জুটলো। জঙ্গলের দূর প্রান্তে গাছের ওপরকার আকাশ জ্যোৎস্নায় সাদা দেখাচ্ছিল। এরা সবাই আশপাশের গ্রামের চাষী, গোপ, কাপালী প্রভৃতি শ্রেণীর নরনারী। সবাই মিলে বেশ আমোদ করচে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। রাত্রে ওরাই রাঁধলে, বড় বড় আঙট কলার পাতা পেতে আউশ চালের ভাত আর লাল ডাঁটার চচ্চড়ি। সোনা হেন মুখ করে খেল! যে যখন আসে, আগে দেখি গিরিবালাকে সাষ্টাঙ্গে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করে ছুহাতে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দেয়।

আমি অবিশ্যি ওর ওখানে মচ্ছবের প্রসাদ পাইনি। গিরিবালা আমায় খুব যত্ন করে বসালো দাওয়ায়। আমি বললাম—না, আমি গাছতলায় বসি, বেশ লাগচে তোমার এই জায়গাটা, এত বন আছে খামারকালনায় আমার জানা ছিল না।

আমায় বললে—একটু কিছু সেবা না করে যেতে পারবেন না বাবা।

—ভাত আমি খাবো না।

—না বাবা, ও আউশ চালের মোটা ভাত আপনাদের খেতে দেব কি বলে? ও ওরা খাবে গিয়ে।

—এত চাল ডাল পেলে কোথায়? খুব খরচ হয় তোমার দেখচি।

—কিছু না বাবা। ওরাই সব আনে। নিজেরাই রাঁধে, আমোদ করে খেয়ে যায়। ওরা বড্ড ভালবাসে আমাকে। সবই গোপালের ইচ্ছা।

ওর সে বিগ্রহ আমি দেখলাম। খুব ফুল দিয়ে সাজিয়েচে। ছোট্ট একটি পাথরের পুতুলের মত। সে ঘরে সবারই অবারিত দ্বার। চাষীরা পাকা কলা, বাতাবি লেবু, শশা প্রভৃতি ফল নিয়ে এসেচে, গোপালের বেদীর আশেপাশে সেগুলো জমা আছে। সন্ধ্যার সময় ধূপধূনো দেওয়া হয়েচে। ছোট্ট একটা মাটির প্রদীপ মিট্ মিট্ করে জ্বলচে ঘরে।

গিরিবালা আমায় বাতাবি লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে, শশা কেটে কলার পাতায় সাজিয়ে নিয়ে এসে দিলে। মিষ্টির মধ্যে আখের গুড়। গোটা কতক ছোলাভিজে ওই সঙ্গে ওর আশ্রমের আবেষ্টনীতে বসে সেই পূর্ণিমার প্রথম প্রহর রাত্রে বেশ লাগল খেতে।

গিরিবালার মুখে কিছু ভালো কথা শুনবার জন্যে ওরা এসেচে। গিরিবালা বোধহয় প্রতি পূর্ণিমাতেই ওদের কিছু কিছু ভাল কথা শোনায়। যারা এসেচে, তারা দেখি কেবলই বলতে লাগলো, মা, আজ দু'কথা বলবেন না? সন্দে উতরে গিয়েচে, এবার বলুন মা—

গিরিবালা সঙ্কুচিত হতে লাগলো আমার সামনে।

—বাবাঠাকুর বরং কিছু বলুন ওদের। আপনি থাকতি আমি আবার কি শোনাবো?

—সে কি কথা? আমি তো ধর্মকথার আচার্যি নিজেকে বলিনি কোনোদিন। রাজনীতির কথা শুনতে চাও শোনাতে পারি। উড়ো জাহাজ কি করে হোল তার কথা বলতে পারি। কিন্তু তত্ত্ব কথা! বাপরে।

গিরিবালা সলজ্জ মুখে বল্লে—বাবার যেমন কথা! আমিই বা কি কথা বলি? আমি বলি, তাঁর ওপর ভক্তি রাখো, সব হবে। লোকে এসে বিরক্ত করে, আমার গরুর বাছুর হচ্চে না, আমার স্ত্রীর সন্তান হচ্চে না, বেগুনের ক্ষেত থেকে বেগুন চুরি যাচ্চে, গাঁয়ে গরুর ধ্বসা-পশ্চিমের মড়ক লেগেচে, অমুকের বৌয়ের সন্তান হয়ে হয়ে বাঁচে না—এসব আমার কাছে নালিশ। বিহিত করে দ্যাও মা।

—তবে তো খুব দায়িত্ব তোমার—

—বাবা, ওরা কোথায় যাবে বলুন? সংসারে ধরে কাকে? কার ওপর নির্ভর করে? একটা কিছু চাই তো। আমাকেই এসে মা বলে ধরে। আমাকেই সব ধকল সইতে হয়। আমার কি খ্যামতা বল, গোপাল ভালো করবেন। গোপালের প্রসাদী ফুল নিয়ে যাও—যা হয় গোপাল করবেন, তাঁর দয়া। বুজলে না বাবা?

—কাজ হয়?

—হয় বৈ কি বাবা। লাগে তুক্, না লাগে তাক্। ঝাড়ে ঢিল মারলে কোনো বাঁশে লাগবেই। ওরা সংসারী মানুষ, ওদের বুঝুতে হবে সংসারের ভেতর দিয়েই।—আপনাকে আলো ধরে পৌঁছে দিয়ে আসুক বাবা—

—না, না, আমি বেশ যাবো এখন, সবে তো সন্দে—

—না বাবা, সন্দের সময় এখানে বাঘ বেরোয়। আপনি যান। সঙ্গে লোক দিচ্ছি বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসুক গিয়ে—

বড় রাস্তায় যে লোকটা আমায় আলো ধরে এগিয়ে দিতে এল, ওর দেখি বড় ভক্তি। আমায় বললে—মা একেবারে সাক্ষাৎ—হেঁ হেঁ উনিই—সব উনিই—

ভক্তিভরে হাত কপালে ঠেকিয়ে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

বললাম—খুব ক্ষমতা নাকি?

—উনিই সাক্ষাৎ—উনিই সব। যা বলবেন, তাই হবে। ছেলে হবে বল্লি ছেলেই হবে, মেয়ে হবে বল্লি মেয়েই হবে। বিষ্টি হচ্চে

না, কলাই মুগ বুনতে পারচিনে, জমি ভাঙতে পারচিনে—মাকে গিয়ে ধরলেই হোল—

—বলো কি ? বাক্‌সিদ্ধ নাকি ?

—কি বললেন বাবু বুঝতি পারলাম না—

—না ঠিক আছে। তারপর ?

—তারপর মোদের বিপদে আপদে সব উনি। ওনারে ছাড়া মোরা জানিনে। ছুটে ছুটে আসচি ওঁর কাছে। মা যা করেন।

লোকটি আমাকে রাস্তায় তুলে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললে—দেন একটু চরণের ধুলো ঠাকুর মশাই। আমরা মুরুক্ষু সুরুক্ষু গরীব মানুষ, কি বুঝি বলুন। অনেক কিছু বলে ফেললাম অপরাধ নেবেন না। যাই, মা এসময় দু'একটা ভালো কথা আমাদের শোনান—

—কি কথা ?

—ভালো কথা! তেনার—ভগমানের কথা। আমাদের ওসব কথা কে বলচে বলুন। চাষা লোক সারাদিন ভুঁই চাষ ক্ষেত-খামার নিয়েই থাকি। মায়ের ছিরিমুখ থেকে ছাড়া আর পাচ্চি কোথায় বলুন—কে মোদের শোনাচ্চে !

ও চলে গেল।

এতক্ষণে বেশ চাঁদ দেখা যাচ্ছে ফাঁকে। খামারকালনায় বড্ড জঙ্গল। ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর মুগ্‌রো পোকা ডাকচে বনে ঝোপে।

গিরিবালাকে অন্য চোখে দেখলাম এতক্ষণ পরে। ওর ঠিক স্থানটি কোথায় বুঝতে পেরেচি। ওর সম্বন্ধে আমার যে বিদ্রূপ-ভরা মনোভাব ছিল তা এখন নেই।

গঙ্গা নদী সব জায়গায় নেই, কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে শাখা নদী, খাল, সোঁতা সমস্ত দেশের সব লোকের কাছে পৌঁছে দেয় জীবনদায়িনী বারিধারা। গিরিবালা বড় নদীর একটি ক্ষুদ্র সোঁতা, ছোট্ট অজ চাষীদের গ্রামে জল বিতরণ করে বেড়াচ্চে, তা যতই ঘোলা হোক,

তবু সেটা জলই, তাতে স্নান করে, জল পান করে লোক তৃপ্ত হয়। নইলে এই সব গরীব লোক বাঁচে কিসে ?

ফটিক চক্কত্তির কথা আর শুনচিনে।

এর পরে আমি গিরিবালাকে অনেকবার দেখেচি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেচি, যেখানে সংকীর্তন হচ্চে কিংবা ভাগবত পাঠ হচ্চে কিংবা কথকতা হচ্চে সেখানেই ও সকলের সামনের সারিতে চুপটি করে বসে আছে এবং হাঁ করে শুনচে। খালের জল আগে হয়তো ঘোলা ছিল, এখন ক্রমে ফর্সা হয়ে আসচে।

চিঠি

আজই সকালে যে এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে, এমন দিনটি যে নির্দিষ্ট ছিল এমন এক আশ্চর্য কাজের জন্য তা যখন ঘুম ভেঙ্গে উঠেছি তখনও জানি কি ?

আজই বিশেষ করে বলচি এজন্যে যে, আজ আমাদের দিল্লী যাওয়ার দিনটি নির্দিষ্ট ছিল। দিল্লীতে জহরলালজী পৌরোহিত্য করবেন আমাদের এক সভায়।

সমস্ত জাতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হয়েছেন দিল্লীর মহাসম্মেলনে, আমিও সেখানে যাবো,বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছি সবাই মিলে মিশে একত্র যাবো। মনে খুব উৎসাহ এবং দীপ্ত আনন্দ।

এক বন্ধুর চিঠি কাল পেয়েছি, তিনি আমার সঙ্গে যাবেন সস্ত্রীক ; আমি যেন কলকাতায় গিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

গ্রামেই থাকি। সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে আমার প্রয়োজন হয় পল্লী-প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ, ছায়াভরা লতাবিতান। সেখান থেকে ভারতবর্ষের মর্মকেন্দ্র দিল্লীতে যাবো। পথে পড়বে কাশী এলাহাবাদ কানপুর—ভারতবর্ষের ইতিহাসের কত সুপ্রসিদ্ধ কর্মভূমি। ঐতিহাসিক দিগন্তের কত বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল এদের পুণ্যভূমিতে।

ভাদ্রের মাঝামাঝি। বনে বনে নাটা কাঁটার ফুলের শিস্ উঁচু হয়ে আছে, ভুর ভুর করছে সুবাস শরতের বাতাসে। এবার বর্ষা বেশি। রোজ লেগেই আছে বৃষ্টি। রাস্তা ঘাটের কাদা শুকুতে চায় না।

ভাবছি এখানে প্রত্যাসন্ন শরতের অপূর্ব শ্যাম শোভা ছেড়ে দিল্লীর

উষর রুক্ষ প্রান্তরে যাবো বটে, কিন্তু কি পাবো সেখানে? জহরলালের সঙ্গে হয়তো পরিচয় হবে; রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে গল্পগুজব করা যাবে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এক টেবিলে চা পানের সৌভাগ্য হয়তো হয়ে যাবে। মনে মনে যে এসব নেই সে কথা অস্বীকার করলে মিথ্যে কথা বলা হবে।

হরিপদ বাঁড়ুয্যে এসে বললে—ভায়া, দিল্লী যাচ্ছ না কি শুনচি?

—যাবো ভাবছি!

—কবে যাবে?

—কাল সকালে।

—তারা খরচপত্র দেবে তো?

—না, তারা কেন দেবে?

—বলো কি, সব খরচ তোমাদের করতে হবে? নইলে ভাবছিলাম তোমাদের রিজার্ভ গাড়িতে না হয় যাবো তোমাদের সঙ্গে। ভাড়াটা লাগতো না।

—রিজার্ভ গাড়িতে গেলেও ভাড়া লাগে দাদা। হরিপদ বাঁড়ুয্যে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বললে—কেন? ভাড়া তো তোমাদের জমা দেওয়াই আছে।

—আছে তো বটেই, কিন্তু যারা সে ভাড়াটা দিয়েছে তারাই যাবে সে গাড়িতে, তোমাদের নেবে কেন?

—তুমি যদি নেও?

—ভাড়া দিতেই হবে। বিনা ভাড়ায় যাওয়া চলে না।

—তবে আর রিজার্ভ মানে কি হোল!

হরিপদ বাঁড়ুয্যে অপ্রসন্নমুখে তামাক খেতে লাগলেন। রিজার্ভ গাড়ি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা একটু অদ্ভুত রকমের সন্দেহ নেই। ভাবছি যে ওঁর ভ্রান্ত ধারণার একটু সংশোধন করে দেওয়া দরকার।

এমন সময় গফুর পিয়ন এসে বললে—বাঁড়ুয্যে মশাই বাড়ি আছেন?

গফুর পিয়ন বড় ভালো লোক। আমাদের এখানে গফুর অনেকদিন আছে, সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা ওর। বাড়িতে ডেকে ওকে জল খাবার খাওয়ায়। কাঁটালের সময় কাঁটাল, আমের সময় আম, তালের বড়ার সময় ঝোলা গুড় আর তালের বড়া। বললাম—গফুর কি পাকিস্তানে চলে যাবে ?

—হ্যাঁ বাবু, আমাকে যশোরে বদলি করেচে।

—সত্যি গফুর, তুমি পাকিস্তানে গেলে আমাদের সকলেরই মনে বড় দুঃখ হবে। গফুর বিনীত হাস্যে বললে—বাবু, আমারও মনডা কি ভাল থাকবে ? আপনাদের এখানে যে রকম কাটিয়ে গেলাম, এমন সোনার চোখে আমাকে অপর জায়গায় কি দেখবে ?

—সকলেই দেখবে। যে ভালো হয় তাকে সকলেই ভালো বলে, বুঝলে না গফুর। গফুর আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললে—বাবুর আজ মোটে একখানা।

গফুর চিঠি দিয়ে চলেই যাচ্ছিল. আমি বললাম—যাবার আগে একটু দেখা করে জল মুখে দিয়ে যেও। সামান্য একটু মিষ্টি-মুখ—

গফুর হেসে চলে গেল।

তারপর চিঠিখানার দিকে চেয়ে বিস্মিত হলাম। কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখায় চিঠিখানা লেখা—পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচরণকমলেষু—

কে চিঠি লিখেছে ? খামখানা এত ময়লা আর পুরোনো আর অন্য রকমের। এ আবার কি রকমের খাম—আজকালের খামের মত নয়।

কোনো ভক্ত পাঠিকার চিঠি নাকি ?

খুলেই ফেলা যাক।

আশ্চর্য ! এ কার চিঠি !

চিঠিখানা এই :—

শ্রীচরণকমলেষু

শ্রীচরণের দাসিকে কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন? অনেক দিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাই নাই। আমরা কি অপরাধ করিয়াছি কি জানি। আঁপনি খড়িবেড়েতে নারান মুখুজ্যের ভাইপোর বিয়েতে বরযাত্রি আসিয়াছিলেন ভরত দাদার মুখে শুনিলাম। কিন্তু এ দাসিকে দর্শন দিতে আসিলেন না কেন, ইহার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আপনি রাগ করিলে দাসির আর কে আছে বলুন? সেই ফুলশয্যার রাতের দিন আমাকে আম খাওয়ানোর জন্যে আপনার কি জেদ। আমি আম খাইনি কেন জানেন, তাহা বলিব। বিয়ের দরুণ ভালো চেলি পরণে ছিল জানো গো মশাই। তাই যদি নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য আম খাইনি। অমনি মশাইয়ের রাগ হোল, কি রাগ সারা রাত্তির। জানো এখন আমার সে সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। না, এ সব লিখিব না তুমি আবার রাগ করিবে। এতদিন এখানে আসিলে না কেন? আমার ওপর রাগ করিও না। তুমি এমন নিদয়, আমার ওপর মায়া হইল না। যাই হউক, তোমার ওপর জোর আছে বলিয়া তাই তোমাকে বার বার জ্বালাতন করিতেছি। মা ও পিসিমা কত দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন একবার আসিয়া তাঁহাদের চিন্তা দূর করিবেন। ভাবিয়া দেখুন কতদিন আপনাকে দেখি নাই, না দেখিয়া আমার মনটার মধ্যে কি রকম হইতেছে। তুমি সেই গান গাহিয়াছিলে, বিভাদিদি গান গাহিয়াছিল, সেই সব কথা মনে পড়ে আর বুক যেন ফাটিয়া যায়। ওগো তুমি আমাকে আর দুঃখ দিও না একবার শ্রীচরণ দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। ওগো, তুমি এবার আসিলে আমি কত গান শুনাবো বিভাদিদির কাছে ও কর কাকাদের বাড়ির সেজ বৌয়ের কাছে কত গান শিখিয়াছি। শুনবে তো? এসেছে হৃদয়ের হাসি অরুণ অধরে। সম্মুখে রাঙা মেঘ করে

খেলা তরণি বেয়ে চলো নাহি বেলা। সুখ যদি না পাও যাও সুখেরি সন্ধানে। কিছু নাহি চাবো গো আমি তোমার বিহনে। তোমাতে করিব বাস দীরঘ দিবস মাস। এই সব গান শিখিয়াছি। তুমি এলে চিলের কোঠায় তুপুরে তু'জনে বসিয়া গাহিয়া শুনাবো। রাণি দিদি ঠাট্টা করে বলিয়া আমার গান গাহিতে লজ্জা করে। যাহোক, এবার ঠিক গান গাহিয়া শোনাবো। আমায় আর কষ্ট দিও না, ওগো অত নিদয় হয়ে দাসিরে চরণে ঠেলিও না। আমার প্রণাম নিও। ইতি তোমার শ্রীচরণের দাসি—

নিরুপমা

তাং ২২শে ফাল্গুন, ১৩২৪ সন।

কুল বেড়িয়া। জেলা নদীয়া।

ভাল বুঝতে পারলাম না। বানান ভুল, ভাষা ভুল, ছেদচিহ্নহীন এ চিঠিখানা কার? নিরুপমা? কে নিরুপমা?

পত্রখানি মনে এক অপূর্ব ভাব এনে দিল। কতদিন আগেকার বিস্মৃত প্রথম যৌবনের সুবাসভরা দিনগুলির বাতাসে মেশানো ছিল যে পিককুলের রসিকতা, নব বসন্তের পত্রশোভা, দায়িত্বহীন জীবনের নিশ্চিত আয়াস, মোহমদির দিগন্ত, অপরূপ মাধুরী এতকাল পরে আবার ফিরিয়ে আনল চিঠিখানা।

তবুও বুঝতে পারলাম না কার এ চিঠি। গত ২৪ সালের চিঠি এল গত ৫৪ সালের ভাদ্র মাসে। আচ্ছা এও কি সম্ভব? আমার এতকাল আগেকার পরলোকগতা স্ত্রী নিরুপমার চিঠি এল আজ ত্রিশ বছর পরে?

এতকাল এ চিঠি কোথায় ছিল? কোন ডাকঘরের কোন্ আলমারির অন্ধকার কোণে আত্মগোপন করে ছিল সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর? আমার যৌবন বয়সের চিঠি এল যখন আজ আমি প্রৌঢ়ত্বে

উপনীত ? আমার ফুলশয্যার পরে নবপরিণীতা বধূর করুণ আহ্বান-লিপিখানি ডাকঘরের কর্মচারীরা এতকাল লুকিয়ে রেখে কি রসিকতা করতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে !

এই চিঠি আসছিল গত ত্রিশ বছর ধরে। কত ঘটনা ঘটে গেল এই ত্রিশ বছরে, আমার জীবনের কত উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। কত শোক, দুঃখ, প্রেম-কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই চিঠিখানা আসছিল।

ত্রিশ বছর পরে এ চিঠি পেয়ে লাভ কি আমার ?

চমৎকার শরৎ দুপুরটিতে শুধু বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম চিঠিখানা হাতে করে। দূর আকাশের কোণে যেন বেলপুকুর গ্রামটিতে আমার প্রথম শ্বশুর বাড়ির চিলে কোঠার ঘরে আমার প্রথম পরিণয়ের নববধূ আজও যেন আমার পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে আছে। চতুর্দশ বর্ষ দেশে অবস্থিতা সেই সুন্দরী বধূটির মুখ এতকাল একেবারেই মনে ছিল না—আজ হঠাৎ অতি আশ্চর্যরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমার স্ত্রী ঘরে ঢুকে বললে—পিয়ন এল দেখলাম, কার চিঠি এল গো ? অমন করে বসে আছ কেন ?

চমকে উঠে চিঠিখানা ঢাকা দিয়ে বলি—পিয়ন ? কই চিঠি কিছু আসে নি। ও সই দিতে নিয়ে এসেছিল।

নিরুপমা মারা গিয়েছে আজ কত বছর ? আটাশ উনত্রিশ বছর খুব হবে। বিয়ের পর কতদিন বেঁচে ছিল বা ? বছরখানেক কি দেড় বছর হবে।

মড়িঘাটের মেলা

আমাদের গ্রাম্য নদীর ধারে মড়িঘাটা বলে ছোট্ট একটা গ্রাম। ক'ঘর বুনোর বাস। এ জেলায় যখন নীলকুঠীর আমল ছিল, দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকুঠীর সাহেবেরা টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে চলে যেত নদীর পাশের চওড়া ছায়াচ্ছন্ন পথ বেয়ে, তখন শ্রমিকের কাজ করবার জন্যে সাঁওতাল পরগণা থেকে যে সব লোক আমদানী করা হয়েছিল, তাদেরি বর্তমান বংশধরগণ এখন একেবারে ভাষায়, ধর্মে, আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালী হয়ে পড়েচে—এদেশে তাদের বলে 'বুনো'। সমাজের নিম্নস্তরের শেষ ধাপে এদের স্থান। লোকের কাঠ কেটে, ধান মেড়ে দিনমজুরি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। সারাদিন খাটুনির পরে তাড়ি খায়। এই তাড়ি খাওয়ার জন্যেই এরা ঘৃণিত হয় পল্লীসমাজে। পল্লীগ্রামে হিন্দু বা মুসলমান চাষীমহলে মদ কেউ ছোঁয় না। ওটা ভদ্রলোকদের একচেটে ব্যাপার।

মড়িঘাটা নদীপথে চার ক্রোশ আমাদের ঘাট থেকে।

সেবার মাঘীপূর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা যাচ্ছে কেউ নবদ্বীপে, কেউ গৌরনগরের ঘাটে। উভয় স্থানই বহু দূর আমাদের গ্রাম থেকে। যাদের নিজেদের গরুর গাড়ি আছে, তারা আগের রাত্রে গাড়ি চড়ে চলে গিয়েছে আঠারো উনিশ মাইল দূরবর্তী গৌরনগরের গঙ্গাতীরের দিকে। অপেক্ষাকৃত সাহসী ও চালাক চতুর যাত্রীরা যাবে ট্রেনে উঠে নবদ্বীপ।

রাধা দুধ দিতে এসে বললে—বাবু, গঙ্গাচানে গ্যালেন না?

—যে ভিড়! মেয়েদের নিয়ে অতদূর যাওয়া—

—তবে মড়িঘাটা যান বাবু নৌকা করে। কত লোক যাচ্ছে।

—সেখানে গঙ্গা কোথায়? মড়িঘাটায় গিয়ে কি হবে?

—না বাবু, সেখানে আজ গঙ্গা আসেন।

—কে বললে ?

—সেখানে এক বুনো সাধু আছে, তাকে মা স্বপ্ন দিয়েছিলেন। আজ দুবার হোল মাঘীপূর্ণিমের দিন গঙ্গা সেখানে আসবেন। মা বললেন, গরীব দুঃখী লোক, যারা নবদ্বীপে বা গৌরনগরে পয়সা খরচ করে যেতে পারেন না—তাদের উদ্ধার করবার জন্যে ঐ মড়িঘাটাতে তিনি আসবেন একদিনের জন্যে। সব গরীব দুঃখী লোক সেখানে যায় আজ দু'বছর ধরে। মস্ত মেলা বসে। যান না আপনি!

কথাটা লাগলো ভালো। গঙ্গাস্নানে উদ্ধার হবার বাসনা যত থাক না থাক, অনেক লোক যেখানে এসে জোটে পুণ্য অর্জনের আশায়, সে স্থানের অসাধারণত্ব অনস্বীকার্য।

অক্রূব মাঝির নৌকো ভাড়া করে সবাই মিলে রওনা হন মড়িঘাটার দিকে। আমাদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে চলেচে মেলা দেখতে। যেখানে মাঠে কুল পেকেচে, সেখানেই তারা নৌকো লাগাবে ডাঙ্গায়, হৈ হৈ করে কুল পাড়তে ছুটবে, ছোলাক্ষেতে ঘুঘু মারবার চেষ্টা করবে গুলতি ছুড়ে, ছোলার ফল তুলবে। প্রথম বসন্তে মাঠে মাঠে ঘেঁটুফুল, বড় শিমুল গাছে শিমুল ফুলের মেলা, কোকিল ডাকচে, জলপিপি চরচে শেওলার দামে, বাতাসে ঘেঁটুফুলের তেতো গন্ধ আর শুকনো কষাড় ঝোপের গন্ধ ভেসে আসচে।

মড়িঘাটা পৌছুতে বেলা বারোটা বেজে গেল।

দূর থেকে একটি কোলাহল কানে গেল। বহুলোকের সমাগম হয়েছে বটে। আমাদের নৌকো ভিড়লো একটা প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়ায়—সেখানে আমাদের মত অমন কত নৌকো ভিড়েচে। বটতলায় কত লোক রান্না করে খাচ্ছে। মেয়েদের ভিড় বটতলার ওপাশের ঘাটে—সেখানে সবাই স্নান করচে, গঙ্গা নাকি মাত্র সেই জায়গাটুকুতেই আসবার অঙ্গীকার করেছিলেন সেই বুনো সাধুর কাছে। সুতরাং

সেখানেই ভিড় করেচে স্নানার্থীরা, তার এক হাত এদিকও নয়, এক ফুট ওদিকও নয়।

অক্রূর মাঝি বললে—মেয়েদের নিয়ে এপারের ভিড়ে কষ্ট হবে। চলুন ওপারে। ওপারে সেই বুনো সাধুর আখড়া। আপনি গেলি জায়গা দেবে। ওই দেখা যাচ্চে তেনার আখড়া। ওপারে রান্না করে খাওয়ার জায়গা হবে খন। নইলি এপারে কনে বা কাঠ কনে বা উনুন—

মেয়েরা বললেন আগে তাঁরা মেলা বেড়িয়ে দেখবেন।

মেলা বেড়াতে গেলেন মেয়েরা। আমিও সঙ্গে আছি। তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরির দোকান, খেল্‌নার দোকান, ঘুন্‌সি ফিতে চিরুনির দোকান, চায়ের দোকান। ভিড় বেশী লেগেছে তেলেভাজা খাবারের দোকানে আর তার চেয়েও ভিড় চায়ের দোকানে।

পাড়াগাঁয়ে চায়ের দোকানে ভিড় বেশী হয়। এখানে যারা এসেচে, এদের মধ্যে চা অনেকেই বাপের জন্মে খায়নি। শৌখীন জিনিস হিসেবে অনেকেই এক পেয়ালা কিনে চেখে দেখচে। বুনো, কাওরা, মালো, ডোম, বাগদি, মুসলমানদের ভিড় বেশী এ সব মেলায়। হ্যাঁ, মুসলমানদেরও। তাদের মেয়েদের উৎসাহ কোনো অংশে কম নয়। 'গঙ্গা'স্নান তারা অবিশ্যি করে না, কিন্তু মেলা দেখতে আসে ও জিনিসপত্তর কেনে।

চায়ের দোকানের ভিড়ের মধ্যে দেখি মা অনিচ্ছুক ছোটছেলের মুখের কাছে চায়ের ভাঁড় ধরে বলচে—খেয়ে নে, অমন করবি তো—এরে বলে চা—ভারি মিষ্টি—দ্যাখো খেয়ে—ওষুধ—জ্বর আর হবে না—আ মোলো যা ছেলে। চার পয়সা দিয়ে কিনে এখন আমি ফেলে দেবো ক'নে? মুই তো দু ভাঁড় খ্যালাম দেখ্‌লি নে? খা—

সরলা পল্লীবধূদের ঠকিয়ে মহকুমা শহরের ঘুঘু দোকানদার অবিনাশ মোড়ল মণিহারি জিনিস বিক্রি করচে।

এরে বলে 'সোহাগী' সাবান! গরম জল করে মেখে ছাখো না

নিয়ে গিয়ে। ভুর ভুর করবে গায়ে গন্ধ! চুলকুনি সেরে যাবে ছেলেদের। সাড়ে ন' আনা দাম, তা তোমাদের কাছে আলাদা কথা, দুটো পয়সা কম দিও! দাও পয়সা—বাবু যে! ভালো আছেন? মাদের এনেচেন বুঝি? বেশ বেশ। প্রাতোপেন্নাম। একটা সিগারেট খান—আসুন—আচ্ছা, পেন্নাম হই—আসবেন তাহলে এরপর দয়া করে। রান্নাবান্না করবেন ওপারে? সেই ভালো— এপারে সত্যিক জাতের ভিড়—

কিন্তু কি চমৎকার লাগে এদের আমোদ, উৎসাহ, ফুর্তি! বছরে একদিন মেলা, এমন উৎসব আসে—ওদের জীবনে। আর সব দিন এরা বেগুন পোঁতে, ধান মাড়ে, কলাই মাড়ে, হলুদ শুকোয়। আজ এসেচে ছেলেমেয়ের হাত ধরে মেলা বেড়াতে। খাবে না চা, কিনবে 'সোহাগী' সাবান?

নদীর ধারে লোকেরা রেঁধে খাচ্চে। সবাই কিনচে নূতন হাঁড়ি, মাছ ও আলু। আমার বেশী ভাল লাগে দেখতে লোকে কি খায়। বেশীর ভাগ লোকে রেঁধেচে মাছের ঝোল আর ভাত। আলু ও বেগুন কুটে দিচ্চে ঝোলে। আলু ভাতে, বেগুন ভাতে মাখচে নুনতেল দিয়ে, যাদের ভাত হয়ে গিয়েচে। কপি বিক্রি হচ্চে চড়া দামে। এ অঞ্চলে কপির চাষ নেই, ওটা শৌখীন শহুরে আনাজ বলে গণ্য। কপি সবাই কেনেনি, যারা কিনেচে তারা অনেকে রেখে দিয়েচে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাঁচজনকে দেখিয়ে খাবে। খুব গরীব যারা তারা রাঁধচে শুধু আলু বা মানকচু ভাতে ভাত। একটি মা ও ছেলে একটা আগুট কলার পাতে একত্রে খেতে বসেচে, মোটা লাল আউশ চালের ভাত একরাশ, তার সঙ্গে ছোট্ট এতটুকু আলু ভাতে। তার পাশেই একদল বড় বড় কই মাছ ভাজচে দেখে ছোট ছেলেটা বলচে দ্যাখ্ মা কত বড় মাছ? কই মাছ খাবো মা—

চুপ কর। ওদিকে তাকাতে নেই—খেয়ে নাও—নংকা খাবি? নংকা মেখে দেবো? একজন কুলের অম্বল সাঁতলাচ্ছে ওপাশে।

আমাদের বেলা হয়ে যাচ্চে। মাছও কিনতাম, কিন্তু মাঝি বলে দিয়েছিল সাধুর আখড়াতে মাছ রান্না চলবে না। নৌকো নদী পার হোল। ওপারে মাঠের মধ্যে ঠিক নদীর ধারে সাধুর আশ্রম, পাঁচ-ছ'খানি খড়ের ঘর, নিচু চালা, ছোট নিচু দাওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিকোনো পুঁছোনো ঘরগুলি। গোবর দিয়ে লেপা চওড়া উঠোন। উঠোনের মাঝখানে বাতাবিলেবু গাছে থোকা থোকা সাদা ফুল ও কুঁড়ি, মন মাতানো ভুরভুরে তীব্র গন্ধ দুপুরের বাতাসে।

অনেক যাত্রী আশ্রয় নিয়েচে ঘরের দাওয়ায়, বাতাবিলেবুতলার ছায়ায়। এরা কিন্তু রাঁধচে না। আখড়ায় আজ মচ্ছব, বড় বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না হচ্চে, সাধুর শিষ্যবর্গ মচ্ছবের প্রসাদ খাবে। আমাদের মাঝি গিয়ে আমাদের কথা বলতেই সাধু বেরিয়ে এল। বিনীত ভাবে হাত দুটি জোড় করে বললে—আসুন বাবাঠাকুর। বামুনের পায়ের ধুলো পড়লো। বড্ড ভাগ্যি আমার।

বললাম—আপনার আখড়াটি বেশ ভালো দেখছি।

—আপনাদের দয়া।

আঙুল ঊর্ধ্বদিকে তুলে বললে—আর তেনার দয়া। সে জনার দয়া। তা একটা কথা হচ্চে, এসেছেন যখন দয়া করে তখন রান্নাবান্নার যোগাড় করে দিই। মা ঠাকরুণ তো আছেন।

বললাম—অন্য কোনো যোগাড়ের দরকার নেই। সব আছে আমার সঙ্গে। আপনি শুধু রান্না করবার একটা স্থান দেখিয়ে দিন আর উনুন খুঁড়বার জন্য দয়া করে একখানা শাবল যদি থাকে তো পাঠিয়ে দিন। মাঝি উনুন খুঁড়ে দেবে এখন। ঐ মাঠে শুকনো কাঠ পাওয়া যাবে না?

সাধু হেসে বললে—ওর জন্যি কিছু ভাববেন না। পুব পোতার ঘরখানা নিকোনো পুঁছোনো আছে, ওর দাওয়ায় নতুন উনুন পাতা আছে। কেউ রাঁধেনি সে উনুনে। কিন্তু একটা কথা বাবু—

—কি?

হাত জোড় করে বললে—চাল ডাল আমি দেবো—

—না না, কেন আপনি দেবেন? আমাদের সঙ্গে সব আছে। আমাদের শুধু একটু জায়গা দেখিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

সাধু দুঃখিত হোল বুঝলাম ওর মুখ দেখে, কিন্তু আর কিছু বললে না।

একটু পরে আমরা দলবলসুদ্ধ গাঙের ধারের ঘরখানা দখল করে নিজেদের জিনিসপত্তর সেখানে আনিয়ে নিলাম নৌকো থেকে। সাধু নিজে এসে দুখানা নতুন মাদুর বিছিয়ে দিয়ে গেল দাওয়ায়, বললে—মাঠাকরুণদের জন্যে একখানা মাদুর ঘরের মধ্যে দেবো এনে?

—না, আমাদের সঙ্গে সতরঞ্চি রয়েচে।

সাধু ডাকলে—হরিদাসী, ও হরিদাসী—ইদিকে শুনে যাও—এনাদের জল তুলে এনে দাও—একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সুন্দর বৌ আধঘোমটা দিয়ে এসে দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে বললে—কি বাবা?

—এনাদের এখানে থাকো। যা লাগে এনে দাও। তেঁতুলতলা থেকে চালা করা শুকনো বড়ার কাঠ যত লাগে এনে দাও—মা ঠাকরুণকে শুধোও কি লাগবে।

বৌটি হাসিমুখে দাওয়ায় উঠে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলে। তারপর ছুটলো কাঠ আর জল আনতে। বার বার ছুটোছুটি করে সে এটা ওটা আনতে লাগলো, কেন না শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অনেক জিনিসই আমাদের আনা হয়নি বাড়ি থেকে—যেমন, হাতা আনতে ভুল হয়েচে, জল রাখবার বালতি বা ঘড়া নেই, ডাল ঢালবার পাত্র নেই, শুকনো লঙ্কা খুঁজে পাওয়া গেল না মসলার পুঁটলিতে ইত্যাদি। আমার স্ত্রী অপ্রতিভ মুখে আমার দিকে চেয়ে আমার ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় বললেন—বাবাঃ যে তাড়াতাড়ি তোমার—ওতে কি সুশ্রুম্‌খুলে সব জিনিস গোছানো যায়? অত হুড়বড়ানিতে মাথা গুলিয়ে যায় না?

আমি নির্বিকার ভাবে অন্যদিকে চেয়ে থাকি।

ইতিমধ্যে সাধু বাবাজি একটা বড় আড়াইসেরা পালি ভর্তি মুড়কি এবং একছড়া সুপক্ক মর্তমান কলা নিয়ে এসে বললে—বাবু, সেবা করুন—

—এ সব আবার কেন ?

—কেন বাবু, আমরা এতই অধম জাত যে আমাদের কোনো জিনিস নেবেন না ?

—নিচ্চি তো। জল নিচ্চি, কাঠ নিচ্চি, বাসন-কোসন নিচ্চি—তা হোলে কি নিলাম না বলুন! খাবারদাবার কেন আবার—

—তা হোক্। আমার আখড়ায় আপনাদের মত লোক কখনো আসেনি। আমি জেতে বুনো। ভেক নিয়ে বোষ্টম হইচি। তেনার দয়া। কি বুঝি বলুন ? আমার নাম ছিল রামনাল বুনো। আমার বাপের নাম ছিহরি বুনো। তিনি তবলদার ছিলেন। ভদ্দর নোকের বাড়ি কাঠ কেটে সংসার নির্বাহ করতেন। তেনার বয়েস হয়েছিল অনেক, এক কম একশো বছরে মারা যান। আমার বয়েস কত বলুন দিকি বাবু ?

সাধুব চেহারা বেশ ভালো লেগেছিল আমার। খুব মোটা, জোয়ান, লম্বা চেহারা। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি—অথচ অথর্ব গোছের মোটা নয়, বেশ বলিষ্ঠ, কর্মকুশল হাত পা। লম্বা ধরনের খুব বড় মুখখানা, মস্ত বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখ দুটো, নারদ ঋষির মত এতখানি সাদা দাড়ি। মাথায় লম্বা চুল পেছন দিকে মেয়েদের মত ঝুঁটি করে বাঁধা, অথচ মুখখানিতে বালকের সারল্য ও হাসি। যাত্রাদলের মহাদেবের মত দেখতে।

বললাম—কত হবে, ষাট-বাষট্টি ?

সাধু হেসে বললে—বিশ্বাস করবেন না। উনআশি বছর যাচ্চে—তেনার দয়া—

সত্যিই আশ্চর্য হবার কথা। এমন মর্দ জোয়ান পুরুষটিকে আশি বছরের বুড়ো কোনো ক্রমেই ভাবা যায় না। মুখের চামড়া মসৃণ,

অকুঞ্চিত, বালকের মত। একটি রেখা নেই কোথাও মুখে। অবিশ্যি সেটা খানিকটা সম্ভব হয়েচে মেদবাহুল্যের দরুন। অবাক হয়ে সাধুর দিকে আমি চেয়ে রইলাম।

—বাবু, বিশ্বাস না হয় অম্বরপুরের কাছারীর পুরনো কাগজ দ্যাখবেন। ১৩০১ সালের বন্যের সময় আমি কাছারীতে পেয়াদা ছিলাম। তখন আমার উঠ্‌তি বয়েস। নাঠি ধরতে পারি। শড়কি ধরতে পারি।

—তারপর?

—তারপর এ পথে আলাম। তেনার হুকুম হোল। তা অনেকদিন ভেক নিইচি, আজ ছত্রিশ আটত্রিশ বছর হবে। বিয়ে-থাওয়া করিনি, এই আখড়া যেখানে দ্যাখচেন, এখানে জঙ্গল ছেল, কি গহিন্ জঙ্গল। বাঘ থাকতো। জঙ্গল কেটে আখড়া জমাই।

—ভাল লাগে?

—বড্ড আনন্দে থাকি বাবু। শিষ্যিসেবকরা আসে, সন্দেবেলা জ্যোচ্ছনা ওঠে গাঙের ধারে। ঐ গাঙের ধারের বড় ঘরখানা হোল ঠাকুরঘর। ওর দাওয়ায় বসে খোল কত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করি। একটা কথা বাবু, পথচলতি লোক আমার আখড়ায় এলি ফিরতি পারে না। চাল দেই, ডাল দেই,—রেঁধে খাও। আমি ছোট জাত, আমাদের হাতে তো খাবা না? রা বাড়া করো, খাও, মিটে গেল। মানুষের এট্টু সেবা, তা করবার ভাগ্যি কি আমার হবে? তেনার দয়া। বাবু, তামাক সেবা করেন?

—হ্যাঁ, তবে আমার কাছে বিড়ি আছে।

—তামুক সেজে আনি, বসুন।

নদীর ধারে ক্রমে বেলা পড়লো। সাধুর আশ্রমে ভিড় বেড়ে গেল খুব। মচ্ছবের কীর্তন সুরু হোল বাতাবিলেবু তলায়। সাধু সবদিকে তদারক ক'রে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসে। কিন্তু একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে পায় না। এ এসে বলে,

একটা ঘড়া দাও, ও এসে বলে, একটা ঘটি দাও। সাধু উঠে উঠে গিয়ে তাদের জিনিস দিয়ে আসচে। যে যা হুকুম করচে, তখুনি তামিল করচে। এতটুকু অহঙ্কার নেই, সাধুগিরির দম্ভ নেই, যেন সবারই ও চাকর। অনেক লোক আখড়ার বড় উঠানে, ইতস্ততঃ রেঁধে খাচ্চে। সবাই মচ্ছবের ভাত খাবে না বুঝলাম।

একবার হরিদাসী এসে বললে—বাবা, নামযজ্ঞ শেষ হয়েছে, কিছু মুখে দেন এবার। সকাল থেকে খাননি। সাধু বললে—আগে ওদের সকলকে পাতা ক'রে বসিয়ে দাও। আমার খাওয়ার জন্যি ব্যস্ত কেন ? বেলা পাঁচটা হবে। আশ্চর্য হয়ে বললাম—সকাল থেকে কিছু খাননি ?

হরিদাসী বললে—বাবার ওই রকম। সন্দের আগে একবার খান। অন্যদিন সকালে পেঁপে খান, কলা খান, আজ তাও খাননি। আপনি কিছু না মুখে দিলে আমি খেতে বসবো না বাবা।

সাধু হেসে বললে—আচ্ছা যা মা। একটু গুড়জল নিয়ে আয়। মাল্‌সা ভোগ নিবেদন হয়েচে ? যা, বাবুদের জন্যি একটা ভালো দেখে মাল্‌সা নিয়ে আয় দিকি আগে। দুখানা পাটালি বেশী করে দিয়ে আনিস। বাবুদের মাল্‌সা ভোগ খেতে কোনো আপত্তি নেই তো ?

—না, আপত্তি কিসের ?

হরিদাসী চলে গেল এবং খানিক পরে একটা মাল্‌সা ভোগ আমাদের সামনে নিয়ে এসে রাখলে। রান্না হচ্ছিল পাশের ঢেঁকি-শালের এক কোণে। হরিদাসী সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—বাবু, আপনাদের রান্না নেমে গিয়েচে। কলার পাতা কেটে আনি, জায়গা করে দিই—খেতে বসুন, বেলা নেই।—সে আবার চলে গেল।

জিগ্যেস করলাম—বৌটি কে ?

—ওরা গোয়ালী। কাছেই কামদেবপুরে বাড়ি। আমাকে বড্ড ভক্তি করে। একেবারে যেন আর-জন্মের মেয়ে কি মা!

ওরা স্বামী-স্ত্রী আমাদের এখানে মচ্ছবের অন্নভোগ খায়। অনেকে খায়।

আমাদের খাওয়ার সময় সাধু কতবার যে এল গেল, হাতজোড় করে ঢেঁকিশালের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। খাওয়ার শেষে যখন হরিদাসী বড় একবাটি জ্বাল দেওয়া দুধ হাতে ঢুকলো, তখন আমরা প্রতিবাদ জানালাম। দুধ কেন আবার? হরিদাসী জানালে এ দুধ তার নিজের হাতে জ্বাল দেওয়া, খেতে কোনো আপত্তি হবার কারণ নেই।

সাধু বললে—সেবা করুন বাবু। আমি ওরে বলেছিলাম বাবুদের জন্যে দেড় সের দুধ আলাদা করে ক্ষীরের মত জ্বাল দ্যাও। ওঁদের খাওয়ার কষ্ট হবে।

আহারাদির পর বেলা একেবারে গেল। অম্বরপুরের মাঠের বন্য কুলগাছগুলোর পেছনে টকটকে রাঙা সূর্যটা অস্ত যাচ্চে। লেবু-ফুলের সুবাস ছায়াস্নিগ্ধ বাতাসকে মদির করে তুলেচে। শুকনো কষাড়ঝোপের গন্ধ আসচে গাঙের ধার থেকে। মেলা-ফেরত যাত্রীরা আখড়ার সামনে গরুর গাড়িতে উঠে নিজের নিজের গ্রামে রওনা হচ্চে। খেয়াঘাটে একখানা যাত্রীবোঝাই নৌকো এপারের দিকে আসচে। মেলা থেকে যারা বাড়ি ফিরচে তাদের কারো হাতে তেলেভাজা পাঁপরের গোছা, কারো হাতে একটা কপি, কারো হাতে নতুন বঁটি।

মাঝি আবার ওপারে গেল মেয়েদের নিয়ে। যাবার আগে অপরাহ্নের ছায়ায় আর একবার মেলা দেখতে চায় মেয়েরা। আমি গেলাম না। সাধুর সঙ্গে বসে গল্প করছি দেখে স্ত্রীও কিছু বললেন না।

সাধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাক, এ বছরের মত মেলা শেষ হয়ে গেল। আবার যদি বাঁচি আসচে বছর, তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আসবেন তো বাবু?

কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, একটা কথা। মড়িঘাটের এখানে গঙ্গা আসেন কে নাকি স্বপ্ন দেখেছিল? আপনি নাকি?

সাধু গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে। কেমন এক অদ্ভুত ধরনের হাসি ওর দাড়ির জাল ভেদ করে ওর সারা মুখখানায় বিস্তারলাভ করলে। কি চমৎকার জ্ঞান ও কৌতুকমিশ্রিত হাসির ছবি, যেন অতি প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ ঠাকুরদাদা কৌতুক ও করুণার হাসি হাসচেন তার অবোধ নাতিটির প্রশ্ন শুনে।

বললে—স্বপ্ন-টপ্ন নয়। এখানকার গরীব লোকে পয়সা খরচ করে গঙ্গায় নাইতে যেতে পারে না মাঘী পূর্ণিমায়। তাই রটিয়ে দিয়েছি মা গঙ্গা এই মড়িঘাটার গাঙে আসবেন বলেচেন আমার কাছে পূর্ণিমার যোগের দিন। মন শুদ্ধু করে নাইলে এখানেই গঙ্গা! তিনি নেই কোন্ জায়গায়?

সন্ধ্যা হবার আগেই সাধুর কাছে বিদায় নিয়ে যখন নৌকোয় উঠি, তখন ওপারের সেই বটগাছটার পিছন থেকে মস্ত বড় চাঁদখানা উঠচে। এপারে চিক্‌চিকে চখা বালির ঘাটে হাতজোড় করে বুনো সাধুটি দাঁড়িয়ে বলচে—মা-ঠাকরুণকে নিয়ে আবার আসবেন বাবু সামনের বছর।—ভুলে যেও না মা তোমার বুড়ো খোকাকে—দণ্ডবৎ হই মা—যদি বেঁচে থাকি, সামনের বছরে পায়ের ধুলো যেন পড়ে—। দেখি আমার স্ত্রীর চোখে জল।

হাজারি খুঁড়ির টাকা

গ্রামের মধ্যে বাবা ছিলেন মাতব্বর।

আমাদের মস্ত বড় চণ্ডীমণ্ডপে সকালবেলা কত লোক আসতো—কেউ মামলা মেটাতে, কেউ কারো নামে নালিশ করতে, কেউ শুধু তামাক খেতে খোসগল্প করতে। হিন্দু-মুসলমান দুই-ই। উৎপীড়িত লোকে আসতো আশ্রয় খুঁজতে।

আমরা বসে বসে পড়ি হীরুঠাকুরের কাছে। হীরুঠাকুর আমাদের বাড়ি থাকে খায়। পাগলা মত বামুন, বড্ড বকে—আর কেবল বলবে—ও নেড়া, একটু কুলচুর নিয়ে এসো তো বাড়ির মধ্যে থেকে। আমার মাসতুতো ভাই বিধু বলতো—কুলচুর কোথায় পাবো পণ্ডিত মশাই, ঠাকমা বকে। হীরুঠাকুর বলে—যখন কেউ থাকবে না ঘরে, তখন নিয়ে আসবি।

আমাদের গোমস্তা বদ্যিনাথ রায় কানে খাঁকের কলম গুঁজে চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকের পশ্চিম কোণে প্রজাপত্তর নিয়ে বসে বাকি-বকেয়া খাজনার হিসেব করতো। সবাই বলতো বদ্যিনাথ কাকা লোক ভাল নয়। প্রজাদের উপর অত্যাচার-অনাচার করে দাখিলা দিতে চায় না। বাবা এ নিয়ে বদ্যিনাথ কাকাকে বকুনিও দিতেন মাঝে মাঝে। তবু ওর স্বভাব যায় না। বাবা কখনো প্রজাদের কিছু বলেন না। তাঁর কাছে আসতেও প্রজারা ভয় পায়। যখন আসে তখন কিছু মাপ করার জন্যে বা বদ্যিনাথ কাকার বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্যে।

তামাকের অঢেল বন্দোবস্ত আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে। কেনা তামাকে কুলোয় না, সুতরাং হিংলি কিংবা মোতিহারি গাছ তামাক হাট থেকে কিনে আনা হয়। আমাদের কৃষাণ দুলাল মুচি সেগুলো

বাঁশের উপর রেখে দা দিয়ে কাটে, তারপর সেই রাশীকৃত গুঁড়ো তামাক কোতরা গুড় দিয়ে মেখে মেটে কলসী ভর্তি করে রাখা হয়। যে আসচে সেই কলসীর মধ্যে হাত পুরে এক থাবা তামাক বার করে নিচ্চে, কলকে আছে, ভেরেণ্ডা কিংবা বাবলা কাঠের কয়লা আছে একরাশ, সোলা আছে বোঝা বোঝা, চকমকি পাথর আর ঠুকুনি আছে—খাও কে কত তামাক খাবে। গ্রামের কতকগুলি লোক শুধু তামাকের খরচ বাঁচাবার জন্যেই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সকাল-বিকেল আসে—একথা আমার মাসতুতো ভাই বিধু বলে।

দুপুরের বেশী দেরী নেই। হীরুঠাকুরকে আমি বললাম—পণ্ডিত মশায়, নাইতে যাবেন না ?

—কেন ?

—এর পর জোয়ার এলে আপনি নাইতে পারেন না তাই বলচি। নিরীহ সুরে বললাম কথাটা।

—কখন জোয়ার আসে ?

—এইবার আসবে।

—তুমি কি করে জানলে ?

—আমি—আমি জানি। বিধু বলছিল।

—না, বসে নামতা পড়ো। কড়ি-কষার আর্যা মুখস্থ হয়েছে বিধু ? নিয়ে এসো—বলো শুনি।

বিধু না বলতে পেরে হীরুঠাকুরের বেঁটে হাতের চটাপট চড় খায়। আমি হঠাৎ ধারাপাতের ওপরে ভয়ানক ঝুঁকে পড়ি। এমন সময়ে আমাদের হাজারি খুঁড়ি এসে বদ্যিনাথ কাকার সামনে দাঁড়ালো।

হাজারি খুঁড়ি গোপাল ঘোষের পরিবার, ওর ছেলের নাম বলাই, আমার বয়সী, আমাদের সঙ্গে খেলা করে। গোপাল ঘোষ মারা গিয়েছে আজ বছরখানেক, ওদের সংসারে বড় কষ্ট। হাজারির এক

পা খোঁড়া বলে গ্রামের সকলে তাকে হাজারি খুঁড়ি বলে ডাকে। সে এর ওর বাড়ি ঝি-গিরি করে কোনো রকমে দিনপাত করে।

বষ্ঠিনাথ কাকা বললে—কি ?

হাজারি বললে—ট্যাকা।

—কি ?

—ট্যাকা এনেলাম।

—কিসের টাকা ?

—এই ট্যাকা।

হাজারি লজ্জায় জড়সড় হয়ে গেল। বষ্ঠিনাথ কাকা বাবার দিকে চেয়ে বললেন—ও অম্বিক !

বাবা ছিলেন চণ্ডীমণ্ডপের ওদিকে বসে। কেন না এদিকে ছেলেদের নামতা পড়ার গণ্ডগোল ও বিভিন্ন প্রজা-পত্তনের কচকচি তাঁর বরদাস্ত হোত না। তিনি ওদিকে বসে নিবিষ্টমনে তামাক খেতে খেতে কি সব খাতার পাতা ওল্টাতেন। বষ্ঠিনাথ কাকা তাঁকে ডাক দিতে তিনি খাতার পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন—কি ?

গোপাল গয়লার পরিবার কি বলচে শোনো। আমি তো কিছু বুঝলাম না। টাকার কথা কি বলচে।—যাও, বাবুর কাছে যাও।

আমরা নতুন কিছু ঘটনার সন্ধান পেয়ে ধারাপাত থেকে মুখ তুলে কান-খাড়া ত্ব'চোখ ঠিকরে সোজা হয়ে বসলাম।

বাবা বললেন—কি হাজারি, কিসের টাকা বলছিলে ?

—ট্যাকা এনেলাম।

—কিসের টাকা ? তোমরা তো খাজনা কর না। গোপাল গয়লার ভিটের খাজনা মাপ ছিল।

—এজ্ঞে, সে ট্যাকা নয়—

কথা শেষ করেই হাজারি খুঁড়ি একখানা কালোকিষ্টি ময়লা নেকড়ার পুঁটলি খুলে বাবার পায়ের কাছে ঢাললে—একটি রাশ রুপোর টাকা।

বাবা অবাক, বিশ্বনাথ কাকা অবাক, হীরু পণ্ডিত অবাক, আমাদের তো কথাই নাই। গরীব হাজারি খুঁড়ি একটি রাশ নগদ টাকা ঢালচে তার ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি খুলে।

বাবা বললেন—এ কিসের টাকা? এত টাকা কেন এনেচ? তুমি পেলে কোথায়?

হাজারি মুখে ঘোমটা টেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—উনি দিয়ে গিয়েছেন। আপনার ছেলে। আপনার কাছে রাখুন।

এতক্ষণে আমরা সবাই ব্যাপারটা বুঝলাম। হাজারি টাকাটা গচ্ছিত রাখতে এনেচে বাবার কাছে।

বাবা বললেন—টাকাটা আমার কাছে রাখবে?

—হ্যাঁ বাবা।

—কত টাকা আছে?

সে বললে—চারশো। আপনি গুনে দেখেন।

বিশ্বনাথ কাকা টাকা গুনে দেখলে ঠিক চারশো টাকাই আছে। বাবা বললেন—চারশো টাকা পুরোপুরি রাখতে নেই। এক টাকা কম কি এক টাকা বেশী রাখতে হয়। এক টাকা তুমি নিয়ে যাও। কোথায় এতদিন টাকা রেখেছিলে?

—ঘটির ভিতর বাবা।

—একটা কথা শোনো গয়লা-বৌ। তুমি গরীব মানুষ, টাকাটা দুই-এক টাকা করে নিও না। এতে টাকা খরচ হয়ে যাবে, অথচ তোমার কোন বড় কাজে আসবে না।

—বাবা, আপনি যা বলেন, তাই করবো।

হাজারি চলে গেল।

বিশ্বনাথ কাকা বললে—দেখলে অম্বিক, ধুকড়ির ভিতর খাসা মাল! কে জানতো যে ওর ঘরে ঘটির মধ্যে তিনশো চারশো টাকা আছে? ঝি-বৃত্তি করে সংসার চালায় এদিকে; আজকাল মানুষ চেনা দায়।

—যাও, কাজ করগে। সে কথায় তোমার দরকার কি?

এই ঘটনার পর মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। আবার আমরা বসে হীরুঠাকুরের কাছে ধারাপাত মুখস্থ করচি।

এমন সময়ে হাজারির ছেলে বলাই এসে কাঁদো কাঁদো সুরে বষ্ঠিনাথ কাকাকে বললে—মা মারা গিয়েচে নায়েব মশাই।

বষ্ঠিনাথ কাকা চমকে উঠে হাতের কলম ফেলে বললে—তোর মা? কোথায়—কই—তা তো জানিনে—এখানে মারা গিয়েচে?

—না। মোর ভগ্নীপতির বাড়ি, কালোপুরে।

—কবে গিয়েছিল?

—তা আজ দুমাস। মুইও তো সেখানে ছিলাম।

একটু পরে বাবা এলেন বাড়ির ভিতর থেকে। বলাই গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালো বাবার সামনে। বষ্ঠিনাথ কাকা বললে—শুনলে অম্বিক, হাজ্‌রি মারা গিয়েচে।

—সে কি?

—হ্যাঁ। ও তাই বলচে।

--বলিস কিরে বলাই, শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েচে?

—তা হয়েল।

—তা তুই কি মনে করে এলি এখন?

—সে বলবানি। এখন মেলা নোকের ভিড়। নিরিবিলি বলবানি।

বাবা স্বভাবতই ভাবলেন যে বলাই টাকার জন্য এসেচে। কিন্তু তার বদলে সে যা বললে তাতে বাবা একটু অবাক হয়েই গেলেন।

কথাটা যখন বললে তখন বষ্ঠিনাথ কাকাও সেখানে ছিল।

বাবা বললেন—কি কথা বলবি বলাই?

—মোদের ঘরের চাবিটা নায়েব মশায়কে খুলে দিতে বলুন। ঘরে একটা ভাঁড়ে তিনশো ট্যাকা আছে, মা মরণকালে মোরে বলেচে।

—ভাঁড়ে ?

—হাঁ, একটা ভাঁড়ের মধ্যে।

—আর কোনো টাকার কথা বলেচে তোর মা ?

—না।

—আর কারো কাছে কোনো টাকা আছে বলেনি ?

—না। বলেচে ভাঁড়ে ট্যাকা আছে।

—বেশ, তুই চাবি নিয়ে ঘর খুলে দেখগে।—বদ্যিনাথ, ওর ঘরের চাবিটা দিয়ে দাও।

দুপুরের পর বলাই চাবি হাতে আবার আমাদেব বাড়ি এসে বললে—টাকা পেলাম না।

বাবা বললেন—টাকা পেলিনে ? কোথায় গেলো অতগুলো টাকা ?

—ইঁদুরে বাঁদরে নিয়ে কোথায় ফেলেচে বাবা। তখন বললাম অঘোর ঘোষের বাড়িব দিকি বাঁশঝাড়টা কাটিয়ে দেন। ঐ বাঁশঝাড় থেকে ইঁদুর বাঁদব আসে।

—বটে।

—তা মুই যাই ?

—কোথায় যাবি ?

—মুই কালোপুর চলে যাই। ভগ্নীপতির বাড়ি গিয়েই থাকবো। এখানে একা ঘরে থেকে কেডা বাঁধবে, কেডা বাড়বে। মা মরে গেল। দুটো রাঁধা ভাতের জন্যে কার দোরে যাবো ?

—বুঝলাম। তোকে কোন নগদ টাকা দিয়েছিল তোর মা ?

—এক কুড়ি ট্যাকা দিয়ে গেছে। মোর কাছে আছে সে ট্যাকা। মুই তেলেভাজা খাবার কিনে খাই হাটে হাটে। একমুটো ট্যাকা।

—আচ্ছা তুই একবার মাসখানেক পরে আসবি। দেখি তোর মায়ের টাকার যদি কোনো সন্ধান করতে পারি। বুঝলি ?

—সে আর আপনি কোথায় সন্ধান করবা? সে ইন্দুঁরে-বাঁদরে নিয়ে গিয়েচে। বাদ দ্যান।

—তাহলেও তুই আসিস্, বুঝলি?

বলাই চ'লে গেলে বন্তিনাথ কাকা বললে—আরে অম্বিক, তোমাকে একটা কথা বলি। ও টাকাটা তুমি ওকে আর দিও না। দেখচো ওর বুদ্ধিশুদ্ধি? অতগুলো টাকা নাকি ইঁদুরে নিয়ে গিয়েচে। ওকে আজ টাকা দেবে, কাল ওর ভগ্নীপতি ওর হাত থেকে ভুলিয়ে টাকাগুলো নেবে। মাঝে পড়ে—ন দেবায়, ন ধর্মায়। ছেলেমানুষের হাতে অতগুলো টাকা দিতে আছে? বিশেষ করে ওর মা মরণ-কালে যখন বলে যায়নি, তখন তোমার টাকার কথা কবুল করবারই বা দরকার কি? কেউ যদি এর পরে বলে, তখন বললেই হবে ওর মা জামাই-বাড়ি যাবার সময় গচ্ছিত টাকা আমার কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। খাতায় তুলিনি ও টাকা। মুখে-মুখে টাকা রাখা। কে সাক্ষী আছে টাকার?

বাবা বললেন—বন্তিনাথ, সাক্ষী নেই বলচো। তখন চণ্ডীমণ্ডপে কত লোক ছিল জানো তো?

—তারা জানে না কিসের টাকা। তুমি মহাজনী করো, তোমার দেনার টাকা তো হতে পারে।

—খাতায় দেবার কথা প্রমাণ করতে পারবে?

—তা হাতচিঠি একখানা তৈরী করে ফেলি আজই। দূর দূর আগের তারিখ দিই।

—পাগল। টিপসই কে দেবে?

—মরা লোকের টিপসই বুঝে নিচ্ছে কে? কোর্টে তার টিপসই রুজু করাচ্ছে কে? আমার টিপসই যে হাজারির টিপসই নয় তাই প্রমাণ হচ্ছে কিসে থেকে?

বন্তিনাথ কাকা ধড়িবাজ ঘুঘু লোক। ওর পেটে বহু অন্যায়

ফন্দি সর্বদাই বিরাজ করছে, নদীর জলে তেচোকো মাছের ঝাঁকের মতো। বাবা হেসে বললেন—তা হয় না বদ্যিনাথ, এ কোর্টে না-হয় ও গরীব বেচারা হারলো, কিন্তু উচুঁ কোর্টে যে আমি হেরে যাব।

—উচুঁ কোর্ট করচে কে?

—সে কোর্ট নয়—

বাবা আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন।

বদ্যিনাথ কাকা আর কোনো কথা বললে না।

মাস দুই পরে বলাই এসে হাজির হোল একদিন। বাবা বললেন, ভাল আছিস বলাই?

—আপনার ছিচরণ আশীর্বাদে—

—তোর টাকার সন্ধান পেয়েছি।

—পেয়েছেন?

—পেয়েছি। একটা কাজ করতে হবে তোকে। তোদের সেখানে তোদের স্বজাতির মধ্যে কোন মাতব্বর কেউ আছে?

—আছে। তেনার নাম সতীশ ঘোষ।

—আচ্ছা, সেই সতীশ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে আমার এখানে তুই সামনের বুধবারে আসবি। টাকার সম্বন্ধে তার সঙ্গে পরামর্শ করবো।

সেই বুধবারে বলাই আবার এল, সঙ্গে একজন আধবুড়ো লোক। গলায় ময়লা চাদর, পায়ে চটি জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো পায়ে। সামনের দাঁত দুটো একটু উঁচু ওর। বাবা তখন পাড়ায় কোথায় বেরিয়েচেন। আমি আর আমার মাসতুতো ভাই বিধু গাছের কচি ডাব পাড়াচ্চি।

বলাই বললে—এই সতীশ ঘোষকে এনেচি। তোমার বাবা কনে?

সতীশ ঘোষ বললে, প্রাতঃপেনাম। আমাকে আপনার বাবা

ডেকেচেন কেন জানেন কিছু? আমি তো তাঁকে চিনিনে। কখনো দেখিনি। ব্রাহ্মণ দেবতা, ডেকেচেন তাই এলাম।

—আমি তো কিছু জানিনে। বাবা আসুন। আপনি তামাক খাবেন?

—হ্যাঁ বাবা, খাই। তামাক টিকে কোথায়, আমি সেজে নিচ্ছি।

আমি ঠাকুরমাকে গিয়ে বলতেই তিনি বললেন—তোমার বাবা বাড়ি নেই। ভিন্ গাঁ থেকে লোক এলে যত্ন করতে হয়। তাকে গিয়ে জিগ্যেস কর এখন কি তাকে জলপান পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে সতীশ ঘোষ বললে জিভ কেটে—সে কি কথা? ব্রাহ্মণ দেবতা, তাঁর বাড়ি এসে আমি আগে তাঁদের পায়ের ধুলো না নিয়ে জল খাবো কেমন কথা? মা ঠাকরোণ কই?

আমি তাকে ঠাকুরমার কাছে নিয়ে গেলাম। সতীশ গড় হয়ে ঠাকুরমাকে প্রণাম করে জোড়হাতে বললে—আমার উপর কি হুকুম হয়েচে আপনার? আমি তো আপনাদের চিনিনে—তবে মনে ভাবলাম, ব্রাহ্মণ দেবতা যখন হুকুম করেচেন—

মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখি সতীশ ঘোষ আমাদের ভেতর বাড়ির রোয়াকে বসে কাটাখানেক চিঁড়ে-মুড়কি আর আধখানা ঝুনো নারকেল ধ্বংস করচে।

ঠাকুরমাকে একটু মিষ্টি কথা বললে আর রক্ষে নেই। কত প্রজা যে বিপদে পড়ে এসে ঠাকুরমার মনস্তুষ্টি করে শক্ত শক্ত বিপদ পার হয়ে গিয়েচে তার ঠিক নেই। ঠাকুরমার মন অতি সহজেই মিষ্টি কথায় গলে। এদিকে বাবা অত্যন্ত মাতৃভক্ত। ঠাকুরমা যা বলবেন, তাই বেদবাক্য বাবার কাছে। ঠাকুরমা কেবল ভুলবেন না আমাদের কথায়। হাজার মিষ্টি কথা বলে নিয়ে এসো দিকি একটু তেঁতুলছড়া, কি একটু কাসুন্দি, কি এক থাবা কুলচুর! উঁহু, আসল কাজে ঠিক আছে ঠাকুরমা। তার বেলা—এই নবৃনে, ভাঁড়ার ঘরের তাকের

দিকে ঘন ঘন আনাগোনা করা হচ্চে কেন? খবরদার, ভাঁড়ার ঘরের চৌকাঠে পা দেবে না বলে দিচ্চি—

একটু পরে বাবা এলেন। সতীশ ঘোষকে দেখে বললেন—এ কে?—না, না—তুমি খাও—খাও—উঠতে হবে না। খেয়ে নাও আগে—

ঠাকুরমা বললেন—তুমি খাও বাবা, আমি বলচি। এ হোল সতীশ ঘোষ। হাজারির ছেলে বলাই সঙ্গে করে এনেচে কালোপুর থেকে।

—ও বুঝলাম। আচ্ছা, বেলা হয়েচে, আমি চান্ করে আহ্নিক করে নিই। আহারাদির পর কথাবার্তা হবে। তুমিও গঙ্গায় চান্ করে এসো। দিব্যি ঘাট, চখা বালি, কোনো অসুবিধে হবে না।

সতীশ ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপে খেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ঠাকুরমা বললেন—এতটা পথ হেঁটে এসেচ বাবা, একটু জিরিয়ে নাও খেয়েদেয়ে।

বিকেলে বাবা সতীশ ঘোষকে বললেন সব কথা। সতীশ অবাক হয়ে বললে—কত টাকা বললেন?

—চার শো টাকা।

—তা আমায় ডাক দেলেন কেন?

—তার মানে ওর হাতে টাকা দিতে চাইনে। ও ছেলেমানুষ, যেমন ওর হাতে টাকা পড়বে, অমনি ওর ভগ্নীপতি শরৎ ঘোষ ওর হাতে থাবা দিয়ে সমস্ত টাকা কেড়ে নেবে। তাকে আমি চিনি, অভাবগ্রস্ত লোক। ও বেচারী মায়ের ধনে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। তার চেয়ে আমি তোমার হাতে টাকাটা দিই, তুমি রেখে দাও আপাততঃ, ওকে জানানোর দরকার নেই। জানালে বিরক্ত করে মারবে টাকার জন্য, আজ দাও দুটাকা, কাল দাও পাঁচটাকা—ওর সেই ভগ্নীপতি প্ররোচনা দেবে, যা গিয়ে টাকা নিয়ে আয়। বুঝলে না? তুমি টাকাটা রেখে দাও, বলাই সাবালক হোলে সমস্ত টাকাটা

ওর হাতে দিয়ে দেবে। তারপর সে যা হয় করুক গে। এখন তুমি আমি ভগবানের কাছে দায়ী আছি নাবালকের টাকার জন্য। নাবালকের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আমার এবং তোমার।

সতীশ হাতজোড় করে বললে—দেখুন দিকি, এই জন্যই তো বলি ব্রাহ্মণ দেবতা। সাধে কি আর বলি। তা আপনি আমাকে ডাকলেন কেন? আমাকে কেন জড়ান? আপনার কাছেই তো—

—না। বলাই যদি এ গাঁয়ে বাস করতো, তবে টাকা আমিই রাখতাম। ওরা আমার প্রজা, ভিটের খাজনা নিইনে, তবে ব্যাগার দিতে হয় আমার বাড়ির ক্রিয়াকর্মে। প্রজা হয়ে থাকতো, ওর স্বার্থ দেখতাম। এখন যখন চলে যাচ্ছে, সে দায়িত্ব আমি রাখি কেন? সেই জন্যে ওকে বলেছিলাম, তোমার গাঁয়ের মাতব্বর লোক একজনকে ডেকে এনো। কেন, কি বৃত্তান্ত তা আর বলিনি। টাকা অতি খারাপ জিনিস সতীশ, তুমিও তো বিষয়ী লোক, আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে। টাকাটা আমি এনে দিই, তুমি নিয়ে যাও—

—আচ্ছা দেবতা, একটা কথা। আপনার যখন হুকুম, তখন নিয়ে আমি যাবো। তবে মোড়ল মাতব্বর আমি কিছুই নই। আপনাদের ছিচরণের চাকর—এই মাত্তর কথা। মোড়ল মাতব্বর আমি নই। কিন্তু একটা কথা—

—কি?

—যদি বলাই সাবালক হওয়ার আগে মারা যায়, তবে টাকার কি হবে?

—তাহলে মা ও ছেলের নামে এই দিয়ে স্বজাতি জ্ঞাতিকুটুম ভোজন করিও একদিন। ওদের তৃপ্তি হবে।

—আহা, ওর মা হাজারি বড্ড ভালো লোক ছিল। তার কথা ভাবলে কষ্ট হয়। বড্ড সরল।

সতীশ সেদিন টাকাকড়ি গুনে-গেঁথে নিয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু মাসকয়েক পরেই একদিন এসে হাজির হোল। সেই চণ্ডীমণ্ডপে

হীরুঠাকুরের কাছে তখন আমরা পড়চি। সতীশ ঘোষ এসে বাবাকে প্রণাম করে বললে—সে হয়ে গিয়েচে। আপনাকে আর (আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে) এই খোকাবাবুকে আর এই নায়েববাবুকে একবার যেতে হচ্চে কালোপুর—

বাবা বললেন—মানে ?

—মানে, আপনাদের বলাই আজ তিনদিন হোল গরু চরাতে গিয়ে বাজ পড়ে মারা গিয়েচে।

—বাজ পড়ে !

—আজ্ঞা হ্যাঁ। মরে মাঠেই পড়ে ছিল। সন্দের সময় টের পেয়ে তখন সবাই গিয়ে তাকে দেখে, পড়ে আছে। নিয়তির খেলা, আপনিই বা কি করবেন, আমিই বা কি করবো। এখন চলুন, অপঘাতে মিত্যু, তিনদিন অশৌচ, কাল তার শ্রাদ্ধ। সেই টাকাটা আপনি যেমন হুকুম দেবেন, আপনার সামনে খরচ করবো।

বদ্যিনাথ কাকা আর বাবা পরদিন কালোপুর গেলেন, সঙ্গে আমি। আশ্চর্য হলাম আমরা সকলেই সেখানে গিয়ে। সতীশ ঘোষ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, আটচালা বড় ঘর, চণ্ডীমণ্ডপ, সদর অন্দর পৃথক। সবই ঠিক, কিন্তু লোকজনের সমারোহ, আয়োজন দেখে আমরা তো অবাক। চারশো টাকায় এত লোক খাওয়ানো যায় না, এমন সমারোহ করা যায় না। হাজারি খুঁড়ির বার্ষিক সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধও ওই সঙ্গে হোল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোক খাওয়ানোর বিরাম নেই। আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল বটে, তবুও সাত আটশো টাকার কমে সে রকম খাওয়ানো যায় না, তত সমারোহই করা যায় না। আর কি যত্নটা করলে আমাদের সতীশ ঘোষ! লুচি, ছানা, সন্দেশ, দই। সব সময়ে হাতজোড় করেই আছে।

বাবা বললেন—সতীশ, এ কি ব্যাপার ? তোমার ঘর থেকে

কত খরচ করলে ? তুমি তাদের কেউ হও না, জ্ঞাতি নও, কুটুম্ব নও, তাদের জন্য এত টাকা—

সে হাতজোড় করে বললে—দেবতা, টাকা তো ময়লা মাটি। আপনি হুকুম দেলেন। বলি, করতে যদি হয় তবে ভিন্ গাঁয়ের মা আর ছেলে বেঘোরে মারা গেল, ওদের শ্রাদ্ধ একটু ভাল করেই করি। আপনি খুসি হয়েচেন, দেবতা ?

বগ্নিনাথ কাকা যে অত জাহাঁবাজ ঘুঘুলোক, কালোপুর থেকে ফিরবার পথে বললে—না সত্যি, হাজারি খুঁড়ির পুন্যি ছিল। তাই টাকাটার সদ্ব্যয় হোল। ভালো হাতে পড়েছিল টাকাটা।

ছেলেবেলার কথা এ সব। তখন পল্লীগ্রামের লোক এমনি সরল ছিল, ভালো ছিল—আজ বাবাও নেই, সে সতীশ ঘোষও নেই। এখন দূর স্বপ্নের মত মনে হয় সে সব লোকের কথা। হাজারি খুঁড়ির শ্রাদ্ধের পরে সতীশ ঘোষ আমাদের বাড়িতে অনেক বার এসেছিল। আমার ঠাকুরমাকে মা বলতো, বাবাকে দাদাঠাকুর বলে ডাকতো। সঙ্গে করে আনতো মানকচু, আখের গুড়, ঝিকারহাটি বাজারের কদমা আর জোড়া সন্দেশ। কখনো কখনো ভাঁড়ে করে গাওয়া ঘি আনতো। আমার বড়দিদির বিয়ের সময় ওদের বাড়ির ঝি-বোয়েরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। একখানা ভাল কাপড় দিয়েছিল বিয়েতে।

বাবা মারা যাওয়ার পরে আমরা দেশ ছেড়ে বিদেশে যাই। শুনেছিলাম সতীশ ঘোষ মারা গিয়েচে বহুদিন। আর কোন খোঁজ-খবর রাখিনে তাদের।

প্রত্যাবর্তন

মাথাটা আগে থেকেই ঝিম্ ঝিম্ করছিল। আবার বোধ হয় জ্বর আসচে।

পাল্লা-হরিশপুরের মাইনর স্কুলে পড়ি। বাবার হাতে পয়সা নেই, মা কান্নাকাটি করেন, ছেলেটার লেখাপড়া হোল না—তাই পাল্লা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ষড়ানন চাটুয্যে আমার সাবেক স্কুলের মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধে পাল্লার মাইনর স্কুলে বিনা মাইনেতে পড়তে দিয়েচেন। গ্রামের পুরুত ঠাকুর শ্রীগোপাল চক্কত্তি দয়া করে তাঁর বাড়িতে আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেচেন। আছি এখানে আজ বছরখানেক হোল।

থাকতে পারিনে ভালোভাবে দু' কারণে। সে কথা কেউ জানে না। মা জানতো ; কিন্তু মা তো এখন নেই এখানে।

প্রথম—ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছি আজ একটি বছর। কত ওষুধ খাচ্ছি কিছুতেই সারে না।

দ্বিতীয় কারণটা—আমার ছোট ভাই দেশে আছে, তার নাম নন্তু। বড় চমৎকার ছেলে সে! সাত বছর বয়স হোল। আগে আমায় ডাকতো—'তাতা—ও তাতা—'। এখন 'দাদা' বলেই ডাকে। সুন্দর দেখতে। নন্তুকে না দেখে বড় কষ্ট হয়।

সেদিন টিফিনের ছুটি হবার আগেই মাস্টার মশাইকে বলি—স্যার, আমার জ্বর আসচে—

ননী মাস্টার আমার দিকে চেয়ে সহানুভূতির স্বরে বললেন—আবার জ্বর ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—বাড়ি যাবি ?

—এখন হাঁটতে পারব না, স্যার !

—বেঞ্চিতে শুয়ে পড়। আয় দিকি হাত দেখি—

হাত দেখতে হোল না, গায়ে হাত দিয়েই বললেন—এঃ, বড্ড জ্বর যে ! গা পুড়ে যাচ্চে। শুয়ে পড়।

শুয়েই পড়ি বেঞ্চিতে।

তারপর জ্বরে কখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েচি। যখন জ্ঞান হোল তখন আমতলার স্কুল-বোর্ডিংয়ে আমাদের ক্লাশের গোপালের তক্তপোশে শুয়ে আছি।

গোপাল আমার পাশে দাঁড়িয়ে; বললে—কেমন আছিস বিনোদ ?

সে কোথা থেকে দৌড়ে এসেচে। গায়ে ঘাম, মুখ রোদে রাঙা হয়েচে। বললাম—দৌড়ুচ্ছিলি ?

—হাঁ, ষাঁড় তাড়াচ্ছিলাম—হেড্ মাস্টারের কপিক্ষেত সাবাড় করেচে।

—আমার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখ—জ্বর আছে ?

—হুঁ ! বেশ আছে। বাড়ি যাবিনে ?

—হাঁটতে পারলেই যাবো।

—তাই যা। এখানে শোবার জায়গা নেই, কোথায় থাকবি ? বাড়ি যা।

বাড়ি যাবো কোথায়, তাই ভাবি। এ আমার নিজের বাড়ি নয়। যাঁর বাড়ি থাকি, তিনি বাড়ি-বাড়ি ঠাকুরপুজো করে বেড়ান। তাঁর বাড়িতে খুব খাটতে হয় আমাকে, তাঁর ছোট মেয়েটাকে সর্বদা কোলে করে বসতে হয়। একটু যদি কেঁদে ওঠে খুকি, তার মা আমার উপর চটে যান।

একদিন মনে আছে, স্কুল থেকে বাড়ি গিয়েচি, খিদেয় সমস্ত শরীর হাল্কা হয়ে গিয়েচে। খুকিকে আমার কোলে দিয়ে তার মা রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমি আসবার আগে থেকেই খুকি কাঁদছিল। আমার

কোলে উঠে আরও কাঁদতে লাগলো। আমি কত বোঝালাম, কত ছড়া বললাম, গান গাইলাম, কিছুতেই শুনলে না, কান্নাও থামলো না। ওর মা এমন রেগে গেলেন আমার ওপর, আমার কাছ থেকে খুকিকে নিয়ে নিজে কোলে করে বসলেন। আমায় কিছু খেতে দিলেন না। রাত্রেও আমাকে ভাত দিতেন না বোধ হয়। রাত্রে চক্কত্তি মশায় খেতে বসে বললেন—বিনোদ খেয়েচে ?

তখন কত রাত হয়ে গিয়েচে! খিদেয় অবসন্ন হয়ে পড়েচি। স্কুল থেকে এসে পর্যন্ত একগাল মুড়িও খাইনি।

অন্য দিন এমন সময় কোন্ কালে আমার খাওয়া হয়ে যায়! পুরুত মশায় নবীন দাঁর চণ্ডীমণ্ডপের দাবা-খেলার আসর থেকে রোজই বেশি রাত করে ফেরেন। তারপর তিনি খেতে বসেন।

খুকির মা বললেন—না।

পুরুত মশায় বললেন—কেন ? এত রাত্রেও খায়নি এখনো ? জ্বর হয়েচে বুঝি ?

—না, জ্বর হবে কেন ? বসে পড়ছিল, তাই ভাত দিইনি এখনো।

—যাও, ডেকে দাও। ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েচে, আমার পাশেই বসুক।

—তুমি খেয়ে উঠে যাও, দেবো এখন।

—না, ওকে ডাকো। জায়গা করে দাও এপাশে।

পুরুত ঠাকুরের কথায় আমার জায়গা করে দিলেন খুকির মা। নয়তো আমি জানতাম রাত্রে তিনি আমায় না খাইয়ে রেখে দিতেন। কাউকে কিছু বলা আমার স্বভাব নয়। চুপ করেই থাকতাম।

সেই বাড়িতেই ফিরে যাওয়ার কথা বলচে গোপাল!

সেখানে আমার মা নেই। মা থাকলে—আমায় দেখলে রাস্তা থেকে ছুটে আসতেন। এখানে খুকির মা আমার জ্বর দেখলেই মুখ ভার করে বলবে—ঐ এলেন অসুখ নিয়ে! কে এখন সেবা করে ?

আমার তো বড্ড উপকার হচ্চে ওঁকে দিয়ে! কুটোটুকু ভেঙে দুখানার উপকার নেই। শুধু সেবা করো। বার্লি রে—সাবু রে—

কিছুই করতে হয় না ওঁকে। আমি ওঁকে কখনো কষ্ট দিইনে। আমার রোজ জ্বর লেগেই থাকে। ওঁকে ডাকতে বা কিছু বলতে আমার লজ্জা হয়। উনিও আমার কাছে বড় একটা আসেন না। মিথ্যে বলব না, সে বরং পুরুত মশায় যত রাত্রেই ফিরুন না দাবা খেলে, আমার অসুখ হয়েচে শুনলে আমার শিয়রে এসে বসে আমার হাত দেখবেন; গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখবেন। স্ত্রীকে ডেকে বলবেন সাবু কি বার্লি করে দিতে। নিজে কাছে বসে খাওয়াবেন। সকালে উঠে গোবিন্দ ডাক্তারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ব্যস্ত হয়ে—ও ডাক্তারবাবু, বিনোদ যে অমন ভুগতে লাগলো! পরের ছেলে আমার বাড়ি আছে, অমন করে পড়ে থাকলে মন বড় ব্যস্ত হয়। ওর অসুখের একটা বিহিত করুন।

পুরুত মশাইকে দেখলে বাবার কথা মনে পড়ে। দুজনই নিরীহ; কেউ ওদের মানে না, বরং ওঁরাই সবাইকে ভয় করে চলেন।

বড় যদি হই, পুরুত মশাইয়ের দুঃখু আমি ঘোচাবো। ওঁর ছেলে নেই। আমি ওঁর ছেলে হবো। না, ওঁদের বাড়ি আমি এখন যাবো না। জ্বর আমার এবার খুব বেশি। হয়তো আরও বাড়বে।

গোপালকে আমি বললাম—ভাই, আমি মার কাছে যাবো।

—মার কাছে যাবি! তোদের গাঁয়ে? সে এখান থেকে ছ' কোশ রাস্তা। নদী পার হতে হবে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাটে। পারবি কেন? এই জ্বর গায়ে—

—তা হোক। তুই কাউকে বলিসনে। আমার পকেটে সরকারি ডাক্তারখানার ওষুধ আছে। আমি যাবো। রাত্তিরটুকু তোর খাটে থাকতে দে।

গোপাল রেগে গেল। বললে—দায় পড়েছে তোকে থাকতে দিতে! তোর যত বাজে আবদার! বাড়ি যাবি কি করে এই অসুখ

গায়ে? বাড়ি যাবি বললেই হোল? আমারও খাটে নেই জায়গা। দুজনে শোবো কোথায়? আমি রুগীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইনে। বাড়ি যা।—

মনে বড় দুঃখু হোলো, গরীব বলে সবাই হেনস্তা করে। গোপাল যে আমার এই অসুখ-গায়ে তাড়িয়ে দেবে, তার মানেও তাই।

আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেলা এখনো ঘণ্টা দুই আছে। শরীরটা একটু হালকা মনে হচ্চে। এই দুই ঘণ্টা হাঁটলে কেউটে-পাড়ার খেয়াঘাট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না? খুব পারবো। খেয়াঘাটের ইজারাদার যে ঘরে থাকে, বললে আমাকে জায়গা দেবে না একটু? গোপালের মত নিষ্ঠুর তারা নয়। পুরুত ঠাকুরের বৌয়ের মত নিষ্ঠুর তারা নয়।

—আচ্ছা ভাই, চললাম।

বলেই রওনা হলাম বোর্ডিং থেকে। লুকিয়ে মাঠের রাস্তা ধরলাম। আমি জানি, আমি বেশিদিন বাঁচবো না। মাকে আমার দেখতেই হবে। কারো কাছে যাবো না, মার কাছে যাবো।

চৈত্র মাস। অথচ এমন শীত করে এখনো! বেলা খুব বেড়েচে। মেঠো পথের দুধারে ঘেঁটুফুল ফুটেচে কতো!

বাঘজোয়ানির ঠাকুর-বাড়ি পার হয়ে ফলেয়া গ্রামের পথে পড়ে ছোট্ট খালের খেয়া। একখানা নৌকো আছে। মাঝি থাকে না, নিজেই নৌকো বেয়ে পার হয়ে ওপারে শিমুলতলায় বসি। শিমুলফুল ফুটেচে গাছটাতে, টুপটাপ করে রাঙা ফুল ঝরে পড়চে। শুকনো কঞ্চির বেড়া দিয়েচে পোড়া খালের ধারে ধারে। চাষাদের মুসুরি-ক্ষেতে মুসুরি পেকে গাছ শুকিয়ে গিয়েচে, কিন্তু এখনো মুশুরি তোলেনি। ঘেঁটুফুলের কি সুন্দর সুগন্ধ বেরুচ্চে পড়ন্ত রোদে! নিঃশ্বাস টেনে শুঁকি।

কেবলই হাঁটচি, কিন্তু হাঁটতে পারিনে আর। পা ধরে আসচে।

ফলেয়া গ্রামের পেছনে মস্ত বাঁশবাগানে মরা শুকনো বাঁশপাতার কেমন চমৎকার গন্ধটা! বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে পথটা, তারপর আবার মাঠ। মাঠের মধ্যে বড় একটা যজ্ঞিডুমুর গাছ। থোলো থোলো যজ্ঞিডুমুর পেকে টুকটুক করচে গাছ। আমার গা বমি-বমি করছিল। ডুমুরতলায় বসে বমি করলাম। গা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। জলতেষ্টা পেলো। ঠাণ্ডা জল কোথায় পাই?

অবসন্ন হয়ে থাকলে চলবে না, মার কাছে পৌঁছতে হবে। কখনো একা এত দূর পথ হাঁটিনি। ভয় করচে। অন্য কিছুর ভয় আমার নেই। চিল্‌তেমারি গ্রামের শ্মশানটা রাস্তার ধারেই পড়ে। শ্মশানে নাকি কত লোক ব্রহ্মদত্যি দেখেচে, পেত্নী দেখেচে। চিল্‌তেমারি যেতে অবিশ্যি সন্ধ্যে হবে না। হে ভগবান, যেন সন্ধ্যা না হয়। মাকে দেখতেই হবে। তার আগে যেন সন্ধ্যা না হয়, অথবা না মরি! হে ঠাকুর!

একটা কাদের বাড়ি পথের ধারে। দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম—একটু জল দেবে?

একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে আমার সামনে এসে বললে—কি জাত?

—ব্রাহ্মণ।

—আমাদের জল খাবে? আমরা জেলে।

—তা হোক, দাও।

মেয়েটি একটু পরে একখানা পাটালি আর এক ঘটি জল নিয়ে এসে আমায় দিলে। আমার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে বললে—তোমার কি হয়েচে?

—জ্বর।

—কোথায় বাড়ি?

—মনোহরপুরে।—পাটালি খাবো না। শুধু জল দাও।

জল খেয়ে আমি হেঁটে চললাম অতি কষ্টে। মেয়েটা আমার

দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল কতক্ষণ। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্চে। সে চেঁচিয়ে বললে—আজ এখানে থেকে গেলেই পারতে—হ্যাঁগো ?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—না, আমাকে যেতেই হবে ; মার জন্যে মন কেমন করচে !

আবার মাঠ। কি সুন্দর মাঠ! শুধু আকন্দ ফুল আর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে। যদি শরীর ভালো থাকতো, হয়তো মাঠে হাডুডু খেলতাম বন্ধুদের নিয়ে। সূর্য অস্ত যাচ্চে। এখনো সামনে চিল্‌তেমারি গ্রাম, তারপর কেউটেপাড়ার খেয়াঘাট—যমুনা নদীর ওপর। সন্ধ্যে হলেই আমার ভয় করবে। চিল্‌তেমারির শ্মশান তার আগেই পেছনে ফেলতে হবে ; কিন্তু আর যেন হাঁটতে পারচিনে ! শরীর কেমন করচে !

একটা তুঁতগাছের তলায় গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসে দম নিই। সূর্যটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার হয় না। ভরসা একেবারে ছাড়িনি। আচ্ছা, এই তুঁততলায় যদি আর খানিকটা বসি ? না, তা হলে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাটে পৌছতে পারবো না। আবার জ্বর আসবে নাকি ? শীত করচে আবার।

এক দাগ ওষুধ পকেট থেকে বের করে নাক টিপে খেয়ে নিলাম। বিকট তেতো কুইনিন্ মিক্সার। মা সুপুরি কেটে দেবে বাড়িতে, তখন শুধু মুখে আর ওষুধ খেতে হবে না। চিল্‌তেমারি ছাড়লাম প্রাণের দায়ে জোর হেঁটে। শ্মশান-রাস্তার বাঁ-দিকে তেলাকুচো আর সোয়াদি গাছের নিবিড় ঝোপে অন্ধকার হয়ে আসচে। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখে সন্তর্পণে রাস্তা পার হয়ে যাচ্চি।

কে যেন বলে উঠলো, পারবিনে তুই মায়ের কাছে যেতে। আমরা তোকে যেতে দেবো না। তোকে এই শ্মশানেই রাখবো।

দূর, ওসব মনের ভুল। রাম রাম, রাম, রাম! এখনো অন্ধকার

হয়নি। অন্ধকার না হোলে ওসব বেরুতে পারে না। রাম-নামে ভূত পালায়।

সত্যি, আর কিন্তু হাঁটতে পারচিনে। কেউটেপাড়া এখনো কত দূর! ওই দূরে বাঁশবন দেখা যাচ্চে কেউটেপাড়া গ্রামের। এখনো অনেক দূর। এই বড় মাঠটা পার হতে হবে, জনপ্রাণী নেই। এই সন্দের সময় মাঠে। কেউ দেখবার নেই!

কেন গোপাল আমায় তাড়িয়ে দিলে বোর্ডিং থেকে? আমার ভয়ানক জ্বর এসেচে। আবার জ্বর এসেচে। কেউটেপাড়া কতদূর? চোখে যেন সর্ষের ক্ষেত দেখচি চারদিকে! পুরুত ঠাকুরের স্ত্রী রাগ করে বলেচেন—মাগো, ছেলেটার শুধু জ্বর আর জ্বর! পরের আপদ কে দেখাশুনো করে? আজই বিদেয় করে দাও।

ননী মাস্টার বলেচে—ওর পা ফুলেচে, ও বাঁচবে না। ও এবার যাবে।

ডানদিকে একটা বড় আমগাছ রাস্তার ধারে। ঐখানে একটু শুয়ে জিরিয়ে নেবো? আর এক দাগ ওষুধ খাবো? আর হাঁটতে পারচিনে। ভীষণ জ্বর এসেচে।

হঠাৎ আমার মনে হোল ওই জামতলাতেই মা আঁচল বিছিয়ে বসে আছেন! আমি আসবো বলেই কখন থেকে বসে আছেন। মা এগিয়ে এসেচেন আমায় নিতে।

আমি টলতে টলতে মার কোলে শুয়ে পড়ি। মাথায় একটা কিসের চোট লাগলো! তারপর আমার আর জ্ঞান নেই। অন্ধকার নামলো মাঠে।

পড়ে পাওয়া

কালবৈশাখীর সময়টা। আমাদের ছেলেবেলার কথা।

বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল এবং আরও অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি। বেলা বেশি নেই।

বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড়। সে হঠাৎ কানখাড়া করে বললে—ঐ শোন—

আমরা কানখাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম—কি রে ?

বিধু আমাদের কথার উত্তর দিলে না। তখনো কানখাড়া করে রয়েছে।

হঠাৎ আবার সে বলে উঠলো—ঐ—ঐ শোন—

আমরাও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ।

নিধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—

বিধু ধমক দিয়ে বলে উঠলো—কিছু না মানে ? তুই সব বুঝিস কিনা ? বোশেখ মাসে পশ্চিম দিকে ওরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস ? ঝড় উঠবে। এখন জলে নামবো না। কালবৈশাখী।

আমরা সকলে ততক্ষণ বুঝতে পেরেছি ও কি বলছে। কালবোশেখীর ঝড় মানেই আম কুড়নো! বাঁড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মিষ্টি কি! এই সময়ে পাকে। ঝড় উঠলে তার তলায় ভিড়ও তেমনি। যে আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তারই জয়।

সবাই বললাম—তবে থাক।

কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে। আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ এখনো দূর হয়নি। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না; তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মত চাঁপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে। যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে। সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখুনি চাঁপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে।

এর পর আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম।

অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হোল ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ। ভীষণ ঝড় উঠলো, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগলো পশ্চিম থেকে। বড় বড় গাছের মাথা ঝড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো, ধুলোতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়া বইল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পড়তে বড় বড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামলো।

বড় বড় আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আম ঝরছে শিলাবৃষ্টির মত; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক-এক বোঝা আম। আমরাও যথেষ্ট আম কুড়ুলাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন। ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ি চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে। আমি আর বাদল সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি। পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনা সুদ্ধু নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার

ডালে পথ ভর্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ-অন্ধকারের মধ্যে।

এমন সময় বাদল কি একটা পায়ে বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমায় বললে—ছাখ তো রে জিনিসটা কি ?

আমি হাতে তুলে নিলাম, একটা ছোট টিনের বাক্স, চাবি বন্ধ। এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলে, 'ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স'। টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে। এ আমরা জানি।

বাদল হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়লো। বললে—দেখি জিনিসটা ?

—ছাখ তো, চিনিস ?

—চিনি, 'ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স'।

—টাকাকড়ি থাকে।

—তাও জানি।

—এখন কি করবি ?

—সোনার গহনাও থাকতে পারে। ভারী দেখেছিস কেমন ?

—তা তো থাকেই। টাকা গহনা আছেই এতে।

'টিনের ক্যাশ বাক্স' হাতে আমরা ছু'জনে সেই অন্ধকার তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম। ছু'জনে তখন কি করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে। আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল ঝড় অগ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে।

বাদল বললে—কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—

—তা তো বটেই। কে জানবে আর।

—এখন কি করা যায় বল।

—বাক্স তো তালা-বন্ধ—

—এখুনি ইঁট দিয়ে ভাঙ্গি যদি বলিস তো—ওঃ, না জানি কত কি

আছে রে এর মধ্যে। তুই আর আমি দু'জনে নেবো, আর কেউ না। খুব সন্দেশ খাবো।

ঝড়ের ঝাপট আবার এল। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে চলে গিয়েছে। অন্যদিনে আমাদের দু'জনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।

বাদল বললে—শীতে কেঁপে মরছি। কি করা যাবে বল। বাড়ি কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না। তাহোলে সবাইকে ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কি করবি?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।

—ভাঙ্গি তালা। ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে।

—না। তালা ভাঙ্গিসনে। ভাঙ্গলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙ্গলে, ভেবে ভাখ। কোন গরীব লোকের হয়তো। আজ তার কি কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেবো বাক্সটা।

বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?

—দেবো ভাবছি।

—কি করে জানবি কার বাক্স?

—চল সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।

এক মুহূর্তে দু'জনের মনই বদলে গেল। দু'জনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাক্স ফেরত দেওয়ার কথা মনে আসতেই আমাদের অদ্ভুত পরিবর্তন হোল। বাক্স নিয়ে জল ঝড়ে ভিজে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাড়ি চলে এলাম। বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হোল বাক্সটা।

তারপর আমাদের দলের এক গুপ্ত মিটিং বসলো বাদলদের ভাঙ্গা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন—আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা

হাওয়া বইছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফোটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোষ্টমের ডোবায়।

আমাদের দলের সর্দার বিধুর নির্দেশমত এ মিটিং বসেছিল। বাক্স ফেরত দিতেই হবে—এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ সে প্রস্তাব পেশ কবার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে জিজ্ঞেস করা হোল বাক্স ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাক্সের মালিককে খুঁজে বার করবার। কারো মাথায় কিছু আসে না। এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হোল। যে কেউ এসে বলতে পারে বাক্স আমার। কি করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করবো? মস্ত বড় কথা। কোনো মীমাংসাই হয় না।

অবশেষে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি।

বলেছি—বিধুর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। দু'তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হোল।

বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক। ওর হাতের লেখা ভালো।

বাদল বললে—কি লিখবো বলো—

—লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মত। বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি—

—বল—

—আমরা এক বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাক্স তিনি রায়বাড়িতে খোঁজ করুন। ইতি—বিধু সিধু নিধু তিনু।

আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম—বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি? আমাদের ভালো

নাম লেখো। বিধু বললে—লিখে দাও। ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখো।

তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হোল।

দু'তিন দিন কেটে গেল।

কেউ এল না।

তিন দিন পরে একজন কালোমত রোগা লোক আমাদের চণ্ডী-মণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কি চাও?

—বাবু, ইদিরভীষণ কার নাম?

—আমার নাম। কেন? কি চাই?

—একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?

আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তিভাবে বললাম—কি রকম বাক্স?

—কাঠের বাক্স।

—না। যাও।

—বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।

—কি রংয়ের টিন?

—কালো।

—না যাও—

—বাবু দাঁড়ান, বলছি। মোর ঠিক মনে হচ্ছে না। এই রাঙা মত—

—না, তুমি যাও।

লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে—ওর নয় রে। লোভে পড়ে এসেছে। ওর মত কত লোক আসবে।

আবার তিন চার দিন কেটে গেল।

বিধুর কাছে একজন লোক এল তারপরে। তারও বর্ণনা মিললো না; বিধু তাকে বিদায় দিলে পত্রপাঠ। যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে নেবে আমাদের ইত্যাদি। বিধু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—যাও যাও, যা পারো করো গিয়ে। বাক্স আমরা কুড়িয়ে পাইনি। যাও।

আর কোনো লোক আসে না।

বর্ষা পড়ে গেল ভীষণ।

সেবার আমাদের নদীতে এল বন্যা।

বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু'একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অম্বরপুর চরের কাপালীরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি সেবারেও দেখে এসেছি। কি চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়োর ক্ষেত, লাউ-কুমড়োর মাচা ওদের চরে! দু'পয়সা আয়ও পেতো তরকারি বেচে। কোথায় রইলো তাদের পটল কুমড়োর আবাদ, কোথায় গেল তাদের বাড়ি-ঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগলো অম্বরপুর চরের কাপালীরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এল। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে। আরও দু'একজন প্রজাপত্তর এসেছে খাজনা দিতে। আমরা দু'ভাই বাবার কড়া শাসনে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি। এমন সময়ে একটা লোক এসে বললে—দণ্ডবৎ হই, ঠাকুরমশায়।

বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে অম্বরপুর থেকে। আমরা কাপালী।

—বোসো। কি মনে করে? তামাক খাও। সাজো।

লোকটা তামাক সেজে খেতে লাগলো। সে এসেছে এ গাঁয়ে

চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে নির্বিষখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু'আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সেও এবার ফুরিয়ে এল। চাকরি না করলে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরবে।

বাবা বললেন—আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।

লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তা খাবো। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন সুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্ঠি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরচি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেবো বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াই শো টাকার গহনা আর পটল-বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি—একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুর গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হোল না। সেই হোল সুরু—আর তারপর এল এই বন্যে—

বাবা বললেন—বল কি? অতগুলো টাকা গহনা হারালে?

—অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে—

আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম। বলে উঠলাম—কি রংয়ের বাক্স?

—সবুজ টিনের।

বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধমক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কি দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে এক-ছুটে বিধুর বাড়ি গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কি না?

বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হোলে উকিল হবে, সবাই বলতো।

আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বেশ একটি

ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে—ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা ? গরীবের ওপর এত দয়া আপনাদের ?

বিধু অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে—দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কিনা আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে ? কাকাবাবু, আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে—লিখতে জানো তো ?

না, ও উকীলই হবে বটে !

আমাব বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপাব দেখে যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না।

আমার ছাত্র

মানুষের প্রতি মানুষের এই যে হিংসা, এই যে উলঙ্গ বর্বরতা আচরিত হচ্চে সভ্যতার নামে, শত বৎসরের শিক্ষা সংযম এক মুহূর্তে যাতে করে তৃণের মত উড়ে গেল, উদগ্র লোভ, হিংসা ও লালসার এই যে নগ্ন মূর্তি দেখা গেল চোখে,—তাতে দমে গেলে চলবে না। মানুষ আছে এখনও, মানবতা আছে, মনুষ্য সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ান।

আমাদের গণেশদাদার কথা বলবার যোগ্য বলে এতদিন ভাবতামই না, কিন্তু আজ দেখচি গণেশদাদার ছবি আমার মনের পটে মস্ত বড় হয়ে ফুটে উঠেচে। এর আর একটা কারণ যে গণেশদাদা আমার ছাত্র।

গণেশদাদার নাম গণশা মুচি। আমাদের গ্রামের মুচিপাড়ার ছোট্ট খড়ের চারচালা ঘরে দুটি গরু ও চার-পাঁচটি বাছুর এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, উঠানে লাউমাচা পুঁইমাচা বানিয়ে, পুন্‌কে নটে শাক বুনে, মেটে আলু ও বুনো ওল তুলে হাটে বিক্রি করে সংসার চালাতো।

যখন পাঠশালায় পড়ি, তখন হরিশ জ্যাঠামশায়ের বাড়ি গণেশ মুচি কৃষাণের কাজ করে। আমরা গণেশদাদা বলে ডাকতাম, অন্যলোকে বলতো গণশা মুচি। মিশ্‌কালো, দোহারা গড়ন, মুখে একপ্রকার শান্ত, দীন ভাব, লাজুক-নম্র চোখ দুটি, সর্বদাই যেন অপ্রতিভ, যেন কি একটা মহা অপরাধ করে ফেলেচে সে।

হরিশ জ্যাঠামশায় কড়া প্রকৃতির গ্রাম্য গাঁতিদার। গণেশদাদাকে

ডেকে বলছেন—এই গণশা—বাব্‌লাতলার জমিতে দোয়ার দেওয়া হয়েচে ?

গণেশ অমনি হাত কচলাতে কচলাতে বলতো—আজ্ঞে না, বাবাঠাকুর। কাল তো মোটে লাঙল দেলাম—

—হারামজাদা, এতদিন ঘুমুচ্ছিলে নাকে তেল দিয়ে ? কবে বলিচি চষ্‌তে ও ভুঁই ?

—জমিতি লাঙল না লাগলি কি ক-অ-রবো বাবাঠাকুর। আজ সাঁজবাতির মধ্যি দোয়ার দিয়ে দেবানি—

—না দিলে জুতিয়ে তোমার আজ হাড় খুলে নোব মনে থাকে যেন।

গণেশদাদা আমরা যেখানে খেলা করচি সেখানে এসে হেসে বলতো—বাবাঠাকুর চটে গিয়েচেন।

আমি বলতাম—ও গণেশদাদা, ইংরিজি জানো ?

—ইন্‌জিরি ? কনে থেকে জানবো ? মুই কি লেখাপড়া জানি ?

—শিখবে ?

—শিখিয়ে দাও দাদাঠাকুর তো শিখি—

—শেখো—ওভার মানে ওপর।

—কি ?

—ওভার মানে ওপর, উড্‌ মানে কাঠ, কাউ মানে গরু—

গণেশদাদা মুখস্থ করতে লাগলো। ইউ. পি. পাঠশালায় কুঞ্জ মাস্টারের শেখানো যত বিদ্যা আমার মাথায় ভিড় করে তাদের উগ্রতায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করছিল, তা সবগুলো গণেশদাদার ঘাড়ে না চাপাতে পারলে যেন আমার নিস্তার নেই। সেই থেকে গণেশদাদার ইংরিজি শিক্ষার ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করলাম। গোটা ওয়ার্ডবুকখানা গণেশদাদাকে কণ্ঠস্থ করাবার সে কী দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা আমার। মুখে মুখে শেখানো ছাড়া অবিশ্যি অন্য উপায় ছিল না,

গণেশদাদার ভাষাতেই বলি, 'মা সরস্বতীর ঘরের ঝন্‌কাট কখনো মাড়াইনি যে।'

গণেশদাদা কিন্তু শিখলো অনেক কথা। শ্রুতিস্মৃতির প্রাচীন উপায়ে প্রায় ডজনখানেক ইংরিজি শব্দের ঐশ্বর্যে সে ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠলো। আমিও শিষ্যগর্বে গর্বিত হয়ে উঠলাম রীতিমত।

আমার সে-গর্ব মাঝে মাঝে বড় অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করতো, গণেশদাদার লাজুকতা ও অপ্রতিভ ভাবকে আরও বাড়িয়ে। যেমন একটা উদাহরণ দিই। হরিশ জ্যাঠামশায়ের বাড়ি তাঁর বড় ছেলে ফুটুদা'কে বিয়ের জন্যে কন্যাপক্ষ দেখতে এসেচে—দু'তিনটি ভদ্রলোক, শ্যামনগরের কাছে কোথায় বাড়ি। আমরা ছেলেরা বলাবলি করলাম শ্যামনগর অর্থাৎ শহরের দিকে যতই বাড়ি হোক বাছাধনদের, আমাদের অজপাড়াগাঁ বলে যে নাক সিঁটকোবেন তা হোতে দিচ্চিনে—দেখিয়ে দেবো এ গ্রামের একজন মুচি কৃষাণও ইংরিজি কেমন জানে। সেই ভদ্রলোকের দল যখন হরিশ জ্যাঠামশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে, তখন আমি গণেশদাদাকে ডেকে বললাম—এই দেখুন, এদের মাইন্দার কেমন ইংরিজি জানে—

তাদের মধ্যে একজন কৌতূহলের সুরে বললে—তাই নাকি। দেখি—দেখি—

আমি অমনি বলি—গণেশদাদা, ওভার মানে কি?

গণেশ হাত ওপরে তুলে বললে—ওপোর।

—ওয়াটার?

—জল।

—স্কাই?

—আকাশ।

ইত্যাদি।

এক ডজন শব্দের ক্ষীণ পুঁজি শেষ হোতেই আমি থেমে গেলাম। গণেশদাদার দিকে শহরের চালবাজ লোকদের সপ্রশংস দৃষ্টি পড়ুক—

এই আমার ইচ্ছা। আমার উদ্দেশ্য সফল হোল; শহুরে বাবুরা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—বাঃ, বাঃ, এ লোকটি তো বেশ। কি নাম তোমার? বেশ। এদিকে এসো—

ওরা চার আনা বকশিস করলে তখুনি। অর্থকরী বিদ্যা বটে ইংরিজি।···

সেই থেকে গণেশদাদার কি উৎসাহ ইংরিজি শেখবার। সাতদিনের মধ্যে আর এক ডজন শব্দ কণ্ঠস্থ করে ফেললে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। শীতকাল। বাড়িতে রুটি হচ্চে, দুধ আর গুড় দিয়ে খাবো বলে মনে খুব ফুর্তি। এমন সময় পীতাম্বর রায় জ্যাঠামশায়দের বাড়ি হৈ চৈ শুনে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে লোকে লোকারণ্য। পীতাম্বর রায়, হরিশ জ্যাঠামশায়, নবীন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে। পীতাম্বর রায় খুব চীৎকার করচেন ও হাত-পা নাড়চেন। উঠানের মাঝখানে গণেশদাদা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ব্যাপার শুনে বুঝলাম, পীতাম্বর রায়ের একটি গরু আজ দুদিন হারিয়ে গিয়েছিল, আজ সেটা গণেশদাদার বাড়ির পিছনে মুচিপাড়ার বড় আমবাগানে (যার নাম এ গ্রামে গলায় দড়ির বাগান) লতা দিয়ে বাঁধা ছিল এবং তার লেজ কে দা দিয়ে অনেকখানি কেটে দিয়েচে, ঝরঝর করে রক্ত পড়চে লেজ দিয়ে। এই অপরাধের সন্দেহ গিয়ে পড়েচে গণেশদাদার ওপর, কারণ প্রথমতঃ মুচিরা গরুর চামড়া বিক্রি করে, দ্বিতীয়তঃ গরু গণেশদাদার বাড়ির পিছনে বাঁধা ছিল, তৃতীয়তঃ গণেশদাদা গরীব। সুতরাং গণেশদাদাই রাত্রে গরুটি কেটে চামড়া খুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিল তার বাড়ির পিছনের আমবাগানে। দায়ের কোপও সেই মেরেচে।

পীতাম্বর রায়ের ও হরিশ জ্যাঠামশায়ের যুক্তির মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তা কারো চোখে পড়লো না। গণেশদাদার বক্তব্য প্রথমতঃ

সুসম্বদ্ধ নয়, দ্বিতীয়তঃ ভয়ে তার বুদ্ধিশুদ্ধি (যার আতিশয্য তার কোনোদিনই নেই) লোপ পেয়েছিল, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনে সে পটুত্বের বিশেষ পরিচয় দিল না।

উঃ, সে কি মারটাই মারলেন পীতাম্বর জ্যাঠামশাই ওকে, পা থেকে চটি জুতো খুলে! কত কাল কেটে গিয়েচে, দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর, কিন্তু আজও আমি চোখের সামনে গণেশদাদার যন্ত্রণা ও লজ্জাকাতর মুখ দেখতে পাই। মার বটে একখানা। শুধু শোনা যায় পীতাম্বর রায়ের তর্জন-গর্জন এবং চটাং চটাং চটি জুতার শব্দ গণেশদাদার পিঠে। পিঠ ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো দরদর করে। তখনও পীতাম্বর জ্যাঠার থামবাব চেহারা ছিল না, নীলু বাঁড়ুয্যের ছেলে মণিদাদা, জোয়ান ছোকরা, দৌড়ে গিয়ে পীতাম্বর রায়ের হাত ধরে টেনে এনে নিরস্ত করলে।

আহা, গণেশদাদা বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। আমি জানতাম গণেশদাদা নির্দোষী। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো গণেশদাদাব কান্না দেখে। ইচ্ছে হোল পীতাম্বর জ্যাঠার কান ধরে কেউ এখুনি ঘুরপাক দেয় তো আমার মনের রাগ মেটে।

এ সব বাল্যকালের কথা।

সারা বাল্যকাল ধবে দেখেছি গণেশদাদা লোকের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে দিনান্তে একথালা রাঙা আশচালের ভাত কায়ক্লেশে যোগাড় কবচে। তাতেই তাব কী খুসি!

—ও গণেশদাদা, আজ কি খেলে?

আমি হয়তো প্রশ্ন করি।

তখন গণেশদাদা আস্তে আস্তে বলবে, যেন কল্পনায় খাদ্যগুলো সে আবার পরম তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদ করছে।

—খ্যালাম? তা খ্যালাম মন্দ নয়। তোমার বড় বউদিদি রেঁধেলো অনেকগুলি। খ্যালাম ধরো (আঙুলের পর্বে হিসেব রেখে) ভাত, শুল্‌কোর (গ্রামের নাম) নাঙা ডাঁটা দিয়ে, কুমড়ো দিয়ে, পেঁজ

দিয়ে ঝিঞের ঝাল (তরকারি হিসেবে অদ্ভুত শুধু নয়, বিকট), বাগুন দিয়ে পোঁজ দিয়ে, কাঁচানংকা আর তেঁতুল। তা বেশ খ্যালাম— কি বলো ?

—বেশ খেয়েচ, আবার কি খাবে ?

কোনোদিন জিজ্ঞাসিত না হয়েও একগাল হেঁসে বলতো— দাদাঠাকুর, আজ খুব খ্যালাম—

—কি ও গণেশদাদা ?

—কি বল দিনি ?

গণেশদাদা সকৌতুকে আমার দিকে তাকায়।

—তা কি জানি ? তুমি বলো !

—আজ তোমার বউদিদি বড্ড করেল। উস্তের (উচ্ছে) শাক আর দয়াকলা দিয়ে একটা তরকারি আর পান্ত ভাত।

খাবারটা লোভনীয় বলে মনে না হোলেও মৌখিক তারিফ না করে উপায় নেই গণেশদাদার কাছে।

খাওয়ার তো এই দশা—পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড় কিংবা গামছা ছাড়া আমি তো গণেশদাদার ছবি মনেই করতে পারিনে। অথচ··· ব্রাহ্মণপাড়ার অর্ধেক কাজে গণেশকে না হোলে চলেই না। বেশির ভাগই ব্যাগার।

—ওরে গণশা, আজ উঠোনের কাঠগুলো ঘরে তুলে দিয়ে আসিস তো ?

—গণশা, গাছের নারকোলগুলো পেড়ে দিতে হবে ওবেলা।

—গরুটো পণ্টে গিয়েচে রে, তুই দুপুরবেলা একবার এসে গরুটো আজ এনে দিবি—বুঝলি ?

—গণশা, আমার গাছের ডুকাঁদি কাঁচকলা হাট থেকে বিক্রি করে দিতে হবে বাবা—

শুধু মিষ্টিকথা—ব্যাস্। ঐ পর্যন্ত। কখনো গণেশদাদা মুখ ফুটে একটা পয়সা মজুরি এ সব ফাইফরমাশ খাটার জন্যে চাইতো না।

বরং বলতো—বেরাহ্মণ দেবতা, ওনাদের পা ধোয়া জল খেলি স্বগ্‌গো। ওনাদের একটু সেবা করবো তার আবার পয়সা!

কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণের নয়, আমি যে-কোনো জাতির সেবা করতে দেখেচি ওকে অম্লানবদনে। জেলে-পাড়ার অথর্ব বুড়ী বিন্দের মাকে তার সঞ্চিত তেঁতুলকাঠের গুঁড়ি কুড়ুল দিয়ে চ্যালা করে দিতে দেখেচি। কত ক্রিয়াহীন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপগুলি যখন অলস যুবক ও প্রৌঢ়দের পাশা দাবা ক্রীড়ার বিবিধ ধ্বনিতে অথবা দিবানিদ্রাভিভূত ব্যক্তিদের নাসিকাগর্জনে মুখরিত, তখন গণেশদাদা কারো তেঁতুলগাছে তেঁতুল পেড়ে দিচ্চে, না হয় কারো কলাইয়ের গাছ-বোঝাই গাড়ি চালিয়ে খামারে আনচে। ঘামে ওর সারা দেহ ভিজে, মাথার চুল ধূলিধূসর, পেটে পেট লেগেচে, কারণ—এখনও খাওয়া হয়নি।

কখনো দেখিনি গণেশদাদা কারও সঙ্গে ঝগড়া করচে কিংবা চড়াস্বুরে কথা বলচে।

আমার বাল্যকাল কেটে গেল। কলেজে পড়ে দুটো পাস করে গ্রামে ফিরে যেতে পথেই গণেশদাদার সঙ্গে দেখা বেলতলার মাঠে। গণেশদাদা গরু চরাচ্চে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়েই আমার পথ। গণেশদাদাকে ডেকে বললাম—ও গণেশদাদা, চিনতে পারো?

—তা চিনতে পারবো না, দ্যাখোদিনি দা'ঠাকুর। কোলে পিঠি করে মানুষ করলাম আর চিনতি পারবো না? কত বচ্ছর দেখিনি। কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন আমাদের ভুলে?

—মামার বাড়ি। তুমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েচ দেখচি। মাথার চুল পেকেচে হ্যাঁ গণেশদাদা?

—ওমা, তোমাদের কোলে করে মানুষ করলাম, তোমরাই কত বড় হয়ে গেলে—মুই আর বুড়ো হবো না? বয়েস কি কম হোল?

—ভাল আছ, হ্যাঁ গণেশদাদা ?

—হ্যাঁ ভালো। তোমরা সব ভালো ?

গণেশদাদাকে এই বয়সে গরু চরাতে দেখে আশ্চর্য হলাম। কারণ পল্লীগ্রামে গরু চরানো হোল বিষয়কর্মের প্রথম সোপান। সাধারণতঃ বালকেরা এ কাজ করে থাকে—তারপর ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে উঠতে সুরু করে। মোটামুটি সেটা এই রকম :—

১। গরু চরানো (১৭ বছর বয়েস পর্যন্ত)

২। জন খাটা (১৬।১৭ থেকে ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত)

৩। অপরের কৃষাণগিরি করা (২৫।৩০ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত)

৪। নিজের জমিতে চাষ আবাদ করা (এ সৌভাগ্য সকলের ঘটে না)

৫। বাড়িতে ধানের গোলা বাঁধা (যেমন অনেকেই ব্যবসা করে কিন্তু ধনী হতে পারে না, তেমনি চাষ অনেকেই করে কিন্তু গোলা বাঁধতে পারে না। এ সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে চাষীর ভাগ্যে)

৬। কিন্তু এ লিখচি কেন, এ ভাগ্য সকলের হয় না—ব্যবসাদার মাত্রেই কি টাটা-বিড়লা হয় ? তবুও এটার উল্লেখ করতেই হবে—প্রত্যেক চাষীর স্বপ্ন, প্রত্যেক রাখালের অলস-মধ্যাহ্নের স্বপ্ন, প্রত্যেক দিন-মজুরের বর্ষা-দিনে এক হাঁটু জল-কাদায় ধান বপন করতে করতে ক্লান্তি অপনোদনের স্বপ্ন—এটি উল্লেখ না করলে চলবে না। সেটি হোল নিজে মহাজন হয়ে নিজের গোলা থেকে অপরকে ধান কর্জ দেওয়া।

এই উচ্চতম ষষ্ঠ স্তর প্রাপ্তি বহু পুণ্যের ফলে ঘটে।

যাক্, কিন্তু গণেশদাদা এই বয়েসে বিষয়কর্মের প্রথম সোপানটিতে কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে না উঠে পারলো না। পাড়াগাঁয়ে এই বয়সেও যারা গরু চরায়, বুঝতে হবে তারা ভাগ্যলক্ষ্মী দ্বারা নিতান্তই অবহেলিত, তারা নিতান্তই অভাজন। এ প্রশ্ন গণেশদাদাকে করলাম না, যদি ও মনে কষ্ট পায়। আমার কিন্তু মনে বড় কষ্ট হোল

পক্ককেশ গণেশদাদাকে পাঁচন হাতে তালপাতার ছাতি মাথায় গরু চরাতে দেখে।

গণেশদাদা বললে—বোসো, বোসো দাদাঠাকুর। তামুক খাবা ?

—ও শিখিনি।

—এতটুকু দেখিচি তোমারে। কত বড়ডা হয়ে গিয়েচ। হ্যাদে, দিজ্ঞেস করো দিনি সেই ইনজিরি ? মনে আছে কিনা দেখি।

ওঃ, অনেক দিনের কথা—উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালার সেই দিনগুলি কতকাল আগে অতীতে মিলিয়ে গিয়েচে। আজ পনেরো বছর আগের ব্যাপার সেই গণেশদাদাকে ইংরিজি শেখানো। কি কি শিখিয়েছিলাম তাই কি ছাই আমার মনে আছে ?

গণেশদাদা কিন্তু হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে আছে আমার দিকে। বললাম—তুমি বলতে আরম্ভ করো ?

—ওভার মানে ওপর—

—বেশ, বেশ—তারপর ?

—তুমি জিগোও দাদা,—আমি বলি—

—জল ?

—ওয়াটার।

—আকাশ ?

—স্কাই।

—দুধ ?

—মিল্ক।

গণেশদাদার মুখে বিজয়ীর গর্বিত হাসি। তুমি তো ঠকাতে পারলে না দাদাঠাকুর এতদিন পরেও, ভাবটা এই রকম। আমি ভাবচি, এ-ইংরিজি শিখে তালপাতার ছাতি মাথায় গোচারণরত গণেশদাদার কি উপকার হবে ?

গণেশদাদা বললে—বলো বলো—

—পিঁপড়ে ?

—পিঁপড়ে? ওডা তো শিখোওনি দাদাঠাকুর। ও তুমি শিখোওনি। ঝা শিখিইলে, তা মুই এ্যাকটাও ভুলিনি। তা ওডা মোরে শিখিয়ে ছ্যাও, পিঁপড়ের ইন্‌জিরি কি?

—এ্যাণ্ট।

—এ্যাণ্ট? এ্যাণ্ট-এ্যাণ্ট-এ্যাণ্ট-এ্যাণ্ট—

জিউলি গাছটার তলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য গ্রাজুয়েট আমি আমার পক্বকেশ গোচারণরত ছাত্রকে ইংরাজি ভাষার পাঠ দিতে দিতে বড্ড দেরি করে ফেলি, বেলা যায় দেখে গণেশই বললে—তুমি এস দাদাঠাকুর। মুই গরু কডারে জল দেখিয়ে আনি পোড়ার খালে —আজ অনেক কথা শেখলনি—এ সব দেশ মুরুক্ষুর দেশ, ল্যাখাপড়ার কথা কেউ বলে না—মোর মত ইন্‌জিরি ক'জনে জানে, ওই তো সব রাখাল ছোঁড়ারা গরু চরাচ্চে, কই ডেকে শুধোও না জলের ইন্‌জিরি, ধানের ইন্‌জিরি—সব মুরুক্ষু দাদাঠাকুর—সব মুরুক্ষু—

—পোড়ার খালে মাছ পড়চে আজকাল গণেশদাদা?

—ওই হচ্চে ছুচারটো বান, ফলুই, তেচোকো—চলো না একদিন ধত্তি যাই—

—যাবো। ছু-একদিন পরে।

—ঝে ক'ডা দিন গাঁয়ে থাকবা, মোরে শেখাবা কিন্তু—

—নিশ্চয়ই। এবার তোমাকে চার ডজন ইংরিজি কথা না শিখিয়ে আর—

—তোমাদের বাপ মায়ের আশিব্বাদে ঝা মুই শিখিচি, তাতেই মোর সামনে কেউ দাঁড়াতি পারে? ওই তো হিবু ঘরামির ছেলে ওস্‌মান গরু চরাচ্চে—ডেকে শুধোও না—

গণেশদাদা দূরে গোচারণরত একটি তেরো-চোদ্দ বছরের বালকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

গ্রামে এসে গণেশদাদার কথা লোককে জিজ্ঞেস করলাম।

ওর অবস্থা এত খারাপ হোল কেন? কারণ শুনলাম ওর দুই ছেলেই মারা গিয়েচে। বুড়ো হয়েচে বলে লোকের বাড়িতে কৃষাণের কাজে কেউ রাখতে চায় না। জমিদারের দেনার দায়ে সামান্য একটু ভিটে-সংলগ্ন জমি ছিল, তাও বিক্রি হয়ে গিয়েচে। নিজের লাঙল নেই বলে ভাগে চাষ করবার উপায় নেই—যার লাঙল নেই, তাকে বর্গা দেবে কে জমি? সুতরাং এ-বয়েসে বাধ্য হয়েই ওকে গরু চরাতে হচ্চে।

গণেশদাদার বাড়ি গেলাম একদিন। ও বসে বসে কঞ্চি চাঁচচে —ঝুড়ি বুনবে। ঝুড়ি তৈরি করে হাটে বেচলে পয়সা হয়, কিন্তু ও ঝুড়ি বুনচে পরের ব্যাগার। এ আমি জানি। এর একটা মস্ত কারণ, ওকে পরের বাঁশঝাড় থেকে কঞ্চি কেটে আনতে হয়—অপরে তার দামস্বরূপ নেয় একটা ঝুড়ি, না তো একটা গাছ-ঘেরা কঞ্চির ঠোঙা। গণেশদাদার ঘরে কঞ্চির ঝাঁপের বেড়া, চালে খড় নেই—একটা চালকুমড়ো লতা উঠিয়ে দিয়েচে চালে, চালকুমড়োর ফুল আর ফল যথেষ্ট হয়েচে, লতাগুলো চাল ছাড়িয়ে এদিক ওদিক ঝুলে পড়ে বাতাসে দুলচে, একটা ধাড়ি ছাগল ঘরের ছেঁচতলায় কাঁঠাল পাতা পরম তৃপ্তিতে চর্বণ করচে, ওর বৌ গৃহকর্ম করচে—বেশ লাগল আমার। ঘরে পেতল কাঁসার সংস্পর্শ নেই—মাটির কলসী, মাটির হাঁড়ি সরা, মাটির ডাবর, মাটির ভাঁড়ে জল রাখা আছে। ভাত খায় কলার পাতায় নয়তো চাম্‌টার বিলের পদ্মপাতায়। আমাকে বললে—চালকুমড়ো একটা নিয়ে যাও দাদাঠাকুর।

—ও আমি কি করবো?

—নিয়ে যাও, বেশ সুক্তুনি করো তোমরা। মোরা সুক্তুনি রাঁধতে জানিনে। বামুন-বাড়িতে কত সুক্তুনি খেইচি আগে আগে! পস্কার লাগে—

—কেন, বউদিদি শুক্তুনি করতে জানে না?

—অত তেল মসলা কনে পাবো মোরা? দাদাঠাকুরের য্যামন কথা। ও সব তরকারি কি মোরা খেতি জানি, না পারি?

ওদের ঘরের দাওয়ায় একজন খুনখুনে বুড়ি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলাম। গণেশদাদাকে জিজ্ঞেস করাতে ও বললে—আরে ও সেই রতনের মা, ওরে চেনো না? রতন ঘর ছেড়ে পালিয়েচে এক বাগদি মাগীকে নিয়ে। ওর মা যায় কনে? কেউ দেখে না। ছুদিন না খেয়ে ঘরের মধ্যে পড়েছিল। তাই ওরে এনে রেখে দেলাম মোর এখানে। চকির ওপর না খেয়ে মরবে পাড়া পিরতিবাসী—চকি কি ভাখা যায়? তাই ওরে এনে রেখে দেলাম। যদি মোদের জোটে, তোমারও একবেলা জোটবে। তাও নড়তে পারে না, জ্বর, ছর্দি, কাশি। একটু হুম্‌নেপাতি ওছুদ এনে দিয়েলাম যগানন্দপুরের ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। ছু আনা দাম নিয়েল—তা যদি কোনো উপগার হোলো দাদাঠাকুর—তুমি জানো হুম্‌নেপাতি?

—না আমি জানিনে। আচ্ছা আমি দেখবো এখন ওবেলা ওষুধের ব্যবস্থা।

—কি দেবো তোমারে দাদাঠাকুর তাই ভাবচি—

—কিছু দিতে হবে না। তুমি কথা বলো আমি শুনি—

কিন্তু কথা কইতে গণেশদাদা জানে না। তার সংকীর্ণ জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে আজ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর ধরে, সে যতই সামান্য হোক, বলতে জানলে তাই নিয়েই চমৎকার কথার জাল রচনা করা যেতো যা আকাশকে বাতাসকে রাঙিয়ে দিতে পারতো, শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে পারতো—চাম্‌টার বিলের পদ্মফুলের পদ্মগন্ধি রেণু আমার নাকে উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারতো। গণেশদাদা সে সব পারে না। তবুও ওর সঙ্গ আমার এত ভালো লাগে। কথার দরকার হয় না, ওর নিরুপকরণ ও অনাড়ম্বর সাহচর্যই আমার মনে একটি মৌন লিরিকের আবেদন বহন করে আনে। সেবার চলে আসার পর পাঁচ ছ' বছর হবে গণেশদাদার সঙ্গে আবার দেখা।

গণেশদাদার মাথার চুল পেকে একেবারে শনের নুড়ি হয়ে গিয়েচে, পিঠের দিকটা বেঁকে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েচে—সামান্য।

· শরৎকাল। পুজোর ছুটিতে সেবার নদীতে একটু বন্যার আভাস দেখা গিয়েচে। কাশফুল ফুটে আলো করেচে নদীর দুই পাড়। নদীর ধারের মাঠে গণেশ গরু চরাচ্চে, খুঁজতে খুঁজতে বার করলাম। ওর মাথার চুল আর ওর চারিপাশে কাশফুল একই রকম দেখতে। বৃদ্ধ গণেশদাদা সেই পাঁচ-সাত বছর আগের মত তাল পাতার ছাতি মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে গরু চরাচ্চে। কোঁচড় থেকে বের করে কি খাচ্ছিল, আমায় দেখে লজ্জিত স্বরে বললে—সৈরভির মা দুটো চাল ভাজা দেলে, বললে, গরম-গরম একখোলা নামিয়ে ফেললাম, তুমি দুটো নিয়ে যাও—তাই নিয়ে এ্যালাম। বেশ লাগে। —তা এলে কবে দাদাঠাকুর? আর দ্যাখো বড্ড বুড়ো হয়ে পড়িচি, তুমি আসচো, কিন্তু মুই বুঝতে পারলাম না। বলি, কেডা আসে বাবুপানা? চকি তেমন আর ঠাওর হয় না—

—চালভাজা খাচ্চ, দাঁত আছে?

—তা আছে তোমার বাপমায়ের আশিব্বাদে। বলি ও কথা যাক, বিয়ে-থাওয়া করেচ?

—না। বিয়ের আর বয়েস নেই।

—কি কথা বলো দাদাঠাকুর? তোমারে কোলে করে মানুষ করলাম, কালকের কাঁচা ছেলে, বয়েস ফুইরে গেল তোমার? ও কথা বোলোনি। মা লক্ষ্মীকে দেখে মুই চক্ষু বুঁজোবো। বিয়ে করো—কি করচো আজকাল?

—চাকরি করচি।

—বেশ বেশ। মোদের শুনেও সুখ। তা বোসো। এই গাছটার ছিঁয়াতে বোসো—হ্যাদে, তোমরা টুপি পরো? বেনার ডাঁটার খাসা টুপি বুনি দিতি পারি। পস্কার সায়েবের টুপি। নেবা?

—না, আমি সায়েবের টুপি পরিনে।

—বোসো। জিরোও, বড্ড রদ্দুর।

কি সুন্দর নীল আকাশ কাশফুলে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠের ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। সাধারণ ধরনের নীল নয়, সে এক অদ্ভুত ময়ূরকণ্ঠি রংয়ের নীল। ওপার থেকে হু হু হাওয়া বইচে, গণেশ-দাদার মাথার সাদা চুল বাতাসে কাশফুলের মত উড়চে। আমার কাছে ছবিটি বেশ লাগে।

গণেশদাদা এইবার চালভাজা খাওয়া শেষ করে নদীর পাড় বেয়ে জলে নেমে দুহাতে আজ্‌লা করে জল খেয়ে নিয়ে সরস তৃপ্তির সঙ্গে 'আ' বলে একটি দীর্ঘস্বর উচ্চারণ করলে। আমার কাছে এসে বললে—তামুক খাবা ?

—খাইনে।

—দাঁড়াও সাজি। মোর দা-কাটা খরসান তামাক বড্ড তলব। কিছু নেই, শুধু তামাক আর গুড়। বাজারের তামুকে চুন মেশায়। বলি হ্যাদে দাদাঠাকুর, একটু শুধোও দিকি ?

—কি ?

—সেই ইন্‌জিরি। মুই মুখস্ত বলবো ? ওভার মানে ওপর, ওয়াটার মানে জল, বাড্ মানে পাখী, বালির ইন্‌জিরি স্যাণ্ড, মাছের ইন্‌জিরি ফ্লাই—

—উহু—

—কি, মাছের ইন্‌জিরি ফ্লাই নয় ?

—না। তবে কি এ্যাণ্ট ?

—না, এ্যাণ্ট মানে পিঁপড়ে। মাছের ইংরিজি ফিশ্, মাছির ইংরিজি ফ্লাই।

—হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। বলি হ্যাদে বয়েস হয়েচে আজকাল অনেক, সব কথা ঝক্করে মনে পড়ে না, বেস্মরণ হয়ে যাই। আর তুমি না এলি তো চর্চা হয় না, সব মুরুক্ষু—কার সঙ্গে ইন্‌জিরি বলবো বলো দিকি ?

আর এক ডজন ইংরিজি শব্দ বসে বসে আমার জ্ঞানপিপাসু শুভ্রকেশ ছাত্রকে শিক্ষা দিলাম, সেই কাশফুল-ফোটা চরে বসে শরতের অপরাহ্নে। আগের শেখা শব্দগুলোও একবার সে ঝালিয়ে নিলে মহা উৎসাহে। তারপর সেই বিদ্যার বোঝা বহন করে সেই বছরের মাঘ মাসে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গণেশদাদা পরলোক যাত্রা করলে। পর বৎসর পুনরায় দেশে ফিরে গিয়ে আর ওকে দেখতে পাইনি।

কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে, কি ইংরিজি শিক্ষার দিক থেকে গণেশদাদা সাবাজীবন প্রথম সোপানেব দিকেই রয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে, আমাদের অনেককে অতিক্রম করে, অনেক উঁচুতে গিয়ে পৌঁচেছিল। তাই আজকার দিনে বার বার তার কথা মনে পড়ে।